RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION

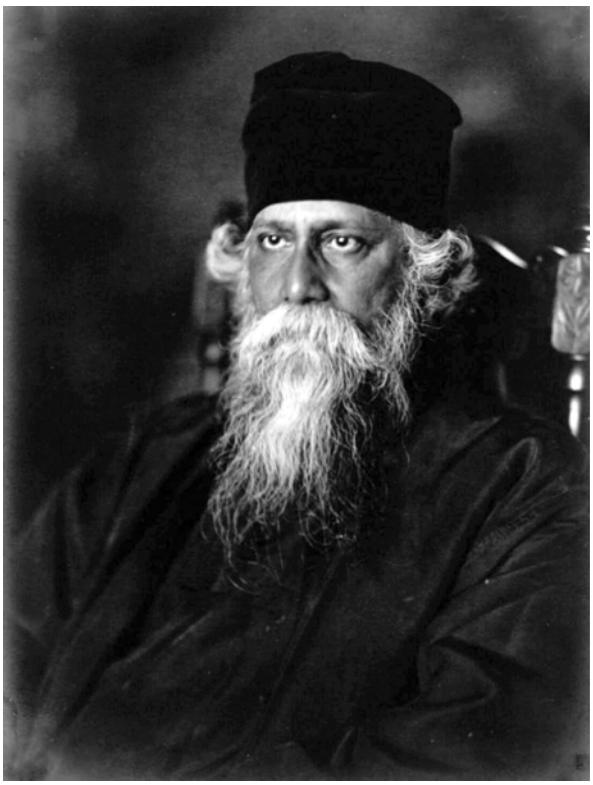

Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.C	Units
3	3.1	1-8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, Phone: (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbudde.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Ranjita Chakraborty	Professor	Department of Political Science, University of North Bengal
Kuntal Mukhopadhyay	Associate Professor (Retd.)	Department of Political Science, Raja Peary Mohan College, University of Calcutta
Satyabrat Sinha	Assistant Professor	Department of Political Science, Presidency University
Kunal Debnath	Assistant Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University
Pradipta Mukherjee	Assistant Professor	Department of Political Science, Hiralal Mazumdar Memorial College for Women, West Bengal State University
Subir Gayen	Assistant Professor	Department of Political Science, Dhruba Chand Halder College
Kaushik Paul	Assistant Professor	Political Science, Centre for Distance and Online Education, Rabindra Bharati University

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Partha Pratim Basu	Professor	Department of International Relations, Jadavpur University

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University
Kaushik Paul	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

October, 2023 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra Bharati University.

Printed at East India Photo Composing Centre

209A, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006.

C.C : 3.1

Comparative Politics in Developing Countries

Contents

Unit 1.	**Comparative Politics: Approaches and Methods**	1-15
Unit 2.	**Media, Communication and Political Culture**	16-25
Unit 3.	**Political Participation, Political Institution and State of Democracy**	26-37
Unit 4.	**Politics of Development/Underdevelopment and relevance of Developing Countries**	38-47
Unit 5.	**Decolonization, Nation building and the Post-Colonial State**	48-56
Unit 6.	**Cultural Pluralism and Ethnic Conflict**	57-66
Unit 7.	**Globalization and the Developing World**	67-73
Unit 8.	**New Social Movements and Politics of Alternative Development**	74-86

পাঠক্রম : ৩.১

Unit-1

Comparative Politics: Approaches and Methods

(তুলনামূলক রাজনীতি : দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিসমূহ)

বিষয়সূচি :

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 ভূমিকা

1.3 তুলনামূলক সরকার এবং তুলনামূলক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য

1.4 তুলনামূলক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

- **1.4.1** সাবেকি বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি
- **1.4.2** আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি
- **1.4.3** নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি
- **1.4.4** মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি

1.5 তুলনামূলক রাজনীতির পদ্ধতিসমূহ

1.6 উপসংহার

1.7 সারাংশ

1.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

1.9 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

1.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় তুলনামূলক রাজনীতি কি এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ।
- তুলনামূলক সরকার এবং তুলনামূলক রাজনীতির মধ্যেকার পার্থক্য।
- তুলনামূলক রাজনীতির চর্চার পদ্ধতিগুলি কি কি।
- তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে কি কি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।
- তুলনামূলক রাজনীতির চর্চায় সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব এবং সীমাবদ্ধতা।
- তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।
- তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব।
- তুলনামূলক রাজনীতির চর্চায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

1.2 ভূমিকা

তুলনামূলক রাজনীতির চর্চা সমাজের বহু বৌদ্ধিক প্রয়োজনকে পূরণ করে। প্রথমত, এটি নিজ দেশ বা স্বভূমিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, নিজ রাষ্ট্র ছাড়াও অপর রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে তুলনামূলক রাজনীতির সাহায্য করে। তৃতীয়ত, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বৈধ ধারণা নির্মাণ করতে তুলনামূলক রাজনীতি সহায়তা করে। তুলনামূলক রাজনীতির ইতিহাস বহু প্রাচীন। অ্যারিস্টটলের হাত ধরে তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রের সূত্রপাত হয় এবং কালের বিবর্তনে শাস্ত্রটি সময়পোযোগী হয়ে উঠেছে। তুলনামূলক রাজনীতি দুটি বিষয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে, এগুলি হল বিষয়বস্তু (Substance) এবং পদ্ধতি (Method)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরর পূর্বে তুলনামূলক রাজনীতি মূলত পশ্চিমের রাষ্ট্র এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এ পর্বে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংকীর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হত। এক্ষেত্রে মূলত সাংবিধানিক নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, ইত্যাদির উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্লেষণ করা হত। প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্লেষণ করার সেই সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরবর্তীকালে 'তুলনামূলক সরকার' (Comparative government) হিসাবে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে জন্ম হয় আধুনিক অর্থে তুলনামূলক রাজনীতির। তুলনামূলক রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে গবেষক এবং পাঠকমহলের বহু জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার প্রয়াস করে। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গির উপর ব্যাপকভাবে আঘাত করে ১৯৬০-এর দশকের আচরণবাদী বিপ্লব (Behavioural revolution)। আচরণবাদী বিপ্লবের পরবর্তীকালীন সময়ে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণের এক্তিয়ার হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে। এই সময় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরেও সমরূপে আলোকপাত করা হয়। তবে, পরবর্তীকালে থেডা স্কোকপোলের (Theda Skocpol) মতো তাত্বিকদের হাত ধরে রাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা পুনরায় ফিরে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাত্বিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাষ্ট্র এবং তার প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে সওয়াল করেন। নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিজের পূর্বসূরীর তুলনায় আলোচনার এক্তিয়ারটিকে বহুগুণে প্রসারিত করে। যাহোক, যেকোন বিষয়কে সামগ্রিকরূপে আলোচনা করার স্বার্থে গবেষককে কিছু নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এবং তুলনামূলক রাজনীতির অধ্যয়নও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তাদের কার্য, কাঠামো, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদির তুলনামূলক পর্যালোচনা করাই তুলনামূলক রাজনীতির মূল বিষয়বস্তু। তুলনামূলক পদ্ধতির ধরণ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে, এটা বলা যায় যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন তুলনা পদ্ধতিই (Comparison method) শাস্ত্রটির পক্ষে উপযুক্ত। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ববার্ট ডাল (Robert Dahl) মার্কিন গণতন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, গুণাবলী, সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি আলোচনা করেন, এর ফলে মার্কিন গণতন্ত্রের সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। সুতরাং, তুলনামূলক পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার অন্যতম মৌলিক বিষয়।

1.3 তুলনামূলক সরকার এবং তুলনামূলক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য

তুলনামূলক রাজনীতি এবং তুলনামূলক সরকারের মধ্যেকার বিভাজন রেখার উপর স্পষ্টভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হলে রাষ্ট্রবিজান চর্চায় অধিকতর স্বচ্ছ ধারণার সহিত অগ্রসর হওয়া সম্ভব। তুলনামূলক রাজনীতির সাবেকি প্রথাগত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাষ্ট্র এবং তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সাধারণভাবে, জাতীয় সরকারের তুলনামূলক আলোচনাকে তুলনামূলক সরকারের আলোচনা হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। জাঁ ব্লন্ডেল (Jean Blondel) মনে করেছেন, তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং এটি রাষ্ট্রীয় গণ্ডির বাইরের বিষয়সমূহকেও নিজ আলোচনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদিকে, তুলনামূলক সরকার শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় গণ্ডির মধ্যকার রাজনীতি এবং সেইসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে,

যা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্নাইডার সরকারের (Government) পরিবর্তে 'রাজনীতি' (Politics) শব্দটি ব্যবহার করেন, যা নিছক কোনো শব্দার্থগত প্রকরণ (Semantic variation) ছিল না। তিনি বৃহত্তর অর্থে 'রাজনীতি' শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন সময় থেকে শুরু করে তুলনামূলক সরকারের থেকে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তুলনামূলক সরকার সাধারণত সরকারের আইনগত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন আইনবিভাগ, বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগ, ইত্যাদি। অন্যদিকে, তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি ব্যাপক। তুলনামূলক সরকারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে রাষ্ট্র এবং তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু হল রাজনৈতিক ব্যবস্থা। তুলনামূলক সরকারের সাবেকি আলোচনা পশ্চিমী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে গড়ে ওঠা তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার গণ্ডির মধ্যে সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চলে আসে, বিশেষত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বিশ্লেষণ করতে এই শাখাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার মধ্যে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ একটি বিশেষ রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান করে তুলনামূলক সরকারের আলোচনা প্রবাহিত হত। তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা যাবতীয় সাংস্কৃতিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়। তুলনামূলক সরকারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা হত, কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে অবস্থান করেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা করা হত। তুলনামূলক রাজনীতির তুলনায় তুলনামূলক সরকারের আলোচনা ততোধিক তাত্ত্বিক ছিল না তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্র প্রথম থেকেই তত্ত্ব গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তুলনামূলক সরকারের আএলাচনা কিছু নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সংবিধান এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতি র আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যর উপর আলোকপাত করা তুলনামূলক সরকারের আলোচনা মূলত বর্ণনামূলক প্রকৃতির, অন্যদিকে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা বিশ্লেষণমূলক প্রকৃতির। তুলনামূলক সরকারের আলোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিক মানসিকতা এবং মূল্যবোধ আরোপের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার মূল্যমান নিরপেক্ষ প্রকৃতির হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তুলনামূলক সরকারের সনাতনী চর্চার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, তুলনামূলক রাজনীতির আধুনিক আলোচনা পদ্ধতিগত উদ্ভাবন এবং পদ্ধতিগুলির সংশোধনে আগ্রহ প্রকাশ করে। তুলনামূলক রাজনীতি শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা করে না, তা বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাষ্ট্রনায়কদের আচরণ, রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রভাবকেও নিজ আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে। তুলনামূলক রাজনীতি যেকোনো রাজনৈতিক ঘটনা বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করে। এছাড়া, এটি স্থান এবং কাল উভয়কেই সমান গুরুত্বের সহিত বিচার করে। তুলনামূলক রাজনীতি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক যোগাযোগ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য অনুধাবনে প্রয়াস করে। তাই, তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা পদ্ধতি বিষয় নির্দিষ্ট নয় বরং সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য (Generic)। তুলনামূলক রাজনীতি বৃহত্তর অর্থে রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করে। এটি শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ, পরিবার তুলনামূলক রাজনীতির পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তুলনামূলক রাজনীতি বাস্তববাদী আলোচনা পদ্ধতি নির্মাণ করতে আগ্রহী, অর্থাৎ এটি নিয়কানুনের পরিবর্তে রাজনৈতিক পদাধিকারীদের আচরণকে বিশ্লেষণ করতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আচরণবাদী বিপ্লব (Behavioural revolution) তুলনামূলক রাজনীতির পদ্ধতি অনুসরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

1.4 তুলনামূলক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

তুলনামূলক রাজনীতির দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) গ্রহণ করা হয়েছিল এবং বর্তমানেও তা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে

উল্লেখ্য যে, তুলনামূলক রাজনীতির চর্চার তিনটি কাজ রয়েছে। প্রথমত, নিজ দেশকে ভালভাবে বোঝার স্বার্থে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশগুলিকে যথাযথভাবে বোঝার স্বার্থে তুলনামূলক রাজনীতির অধ্যায়ন করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, নিজ দেশের সঙ্গে অপর দেশের তুলনার মধ্য দিয়ে সুসংহত ধারণা নির্মাণের স্বার্থে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তুলনামূলক সরকার এবং তুলনামূলক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তুলনামূলক রাজনীতি সংকীর্ণ আলোচনা ও নির্দিষ্ট রাষ্টকেন্দ্রিক আলোচনার থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর আলোচনায় আগ্রহী, অন্যদিকে তুলনামূলক সরকার নামক শাখার চর্চা শুধুমাত্র বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাটামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাঁ ব্লন্ডেল (Jean Blondel) বলেছেন, তুলনামূলক রাজনীতি অনেক বেশি বিস্তারিত এবং ব্যাপক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং তা রাষ্ট্রের বাইরের বিষয়গুলিকে নিয়েও আলোচনা করে। কিন্তু পূর্বতন শাখা (তুলনামূলক সরকার) শুধুমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রের যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল, তা পরবর্তীকালে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি নামে পরিচিত হতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ধারায় অনেকগুলি দৃষ্টিভঙ্গির (Approach) আগমন ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গুলি হল—

1.4.1 সাবেকি বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Traditional or Institutional Approach)

সাবেকি চিন্তাবিদেরা তুলনামূলক রাজনীতির নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে (যেমন—গণতন্ত্র) আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেন, তেমন বাস্তবের একটি সরকার কতটা সেই আদর্শে পৌঁছাতে পারছে সেটাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, অথবা আইনি-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনা করেন। রর সি. ম্যাকরাইডিস সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির চারটে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছে— (i) অ-তুলনামূলক (noncomparative), (ii) বর্ণনাত্মক (descriptive), (iii) ব্যাখ্যামূলক (explanatory), (iv) সংকীর্ণ (Parochial), (v) স্থিতাবস্থাকারী (Static), এবং একরৈখিক (monographic)। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল তুলনামূলক সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে তার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা, (ক) সংকীর্ণতা (parochialism), (খ) বাহ্যিক গঠন কেন্দ্রিক আলোচনা আধুনিকতা (configurative analysis), এবং (গ) আনুষ্ঠানিকতা (formalism)। অন্যদিকে, হ্যারি একস্টেইন (Harry H. Eckstein) তুলনামূলক সরকারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলিকে আমরা সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা হিসেবে ধরতে পারি, এগুলি হল আদর্শবাদী তত্ত্বগঠন, আনুষ্ঠানিক আইন আলোচনা ও বাহ্যিক গঠন কেন্দ্রিক আলোচনা। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গিও (traditional approach) বলা হয়ে থাকে। ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি আধিপত্যকারী দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে বিরাজ করেছিল। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটল ১৫৮টি নগর রাষ্ট্রের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া, মন্তেস্ক্যু (Charles De Montesquieu) তাঁর *'The Spirit of Laws'* (১৭৪৮) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ (separation of power) নীতির উপর আলোকপাত করেন। এক্ষেত্রেও তিনি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার করেছেন। অ্যালেক্স ডি টকভীল তাঁর দু-খণ্ডের *'Democracy in America'* (১৮৩৫) নামক গ্রন্থে মার্কিন গণতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে চর্চা করেন। তবে, প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ব্রাইস এবং লাওয়েলের হাত ধরে হয়। জেমস ব্রাইসের দ্বারা রচিত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল *'The American Commonwelath'* (১৮৮৮) এবং *'Modern Democracies'* (১৯২১)। অন্যদিকে, লাওয়েল রচনা করেন *'Governments and Parties in Continental Europe'* (১৮৯৬) এবং *'Public and Popular Government'* (১৯১৩), যা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির পথ প্রশস্ত করে।

প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (institutionalism) শব্দটির সঙ্গে 'প্রতিষ্ঠান' (institution) শব্দটি জড়িত রয়েছে। সাধারণভাবে, প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদকে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি (approach) হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানগুলির চর্চা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ সেইসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই আগ্রহ প্রকাশ করে, যা

লিখিত আইন বা নিয়মকানুনের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পার্লামেন্ট, বিচারব্যবস্থা, আইনবিভাগ, বিচারবিভাগ, ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোহী (inductive) পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রথমেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তারপর প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম, কাঠামো, ইত্যাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত আইনি নথিপত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়, যেমন, একটি রাষ্ট্রের সংবিধান। এছাড়া, এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহাসিক বিবর্তন অর্থাৎ তার প্রতিষ্ঠাকাল, কাজকর্মের ইতিহাস, ইত্যাদিও আলোচনা করা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেকার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি এটা মনে করে যে, প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা ক্ষমতাসীন রয়েছেন, তাদের আচরণ (Behaviour) সম্পর্কে অধ্যয়ন করার তুলনায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে (institution) অধ্যয়ন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সব থেকে বড়ো সমালোচনা হল এটির জাতিকেন্দ্রিকতা (ethnocentrism)। বহু সমালোচক এটিকে ইউরোপকেন্দ্রিকতা বা eurocentrism হিসাবেও অভিহিত করেছেন, কারণ এটি শুধুমাত্র পশ্চিমের প্রতিষ্ঠান এবং সরকারগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে।

প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে, যেমন ডেভিড হেল্ড তাঁর *'The Political System'* (১৯৫৩) নামক গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে 'mere factualism' এবং 'hyper factualism' হিসাবে অভিহিত করে সমালোচনা করেছেন। এছাড়া, সমসাময়িক কালে হারম্যান ফাইনার (Herman Finer) তাঁর *'Theory and Practice of Modern Government'* (১৯৩২) নামক গ্রন্থে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেছেন।

1.4.2 আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির আলোচনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। বহু গবেষক এটা মনে করেন যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত নৈকট্যের ফলে গবেষকরা পশ্চিমী দেশগুলিতেই গবেষণা চালিয়েছিল। তবে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রূপ বিকৃত হয়ে পড়ে। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ এবং হিটলারের নাৎসিবাদের প্রসারের ফলে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতি অবরুদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট উপহার দেয় এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি এই নতুন রাষ্ট্রগুলির রাজনীতি বুঝতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া, আচরণবাদের প্রভাব এতটাই বিশাল ছিল যে, এ সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বিজ্ঞানমনস্কতা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল, তারই বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটে আচরণবাদী দৃষ্টিকোণে এবং তুলনামূলক রাজনীতি পর্যালোচনার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলক রাজনীতির চর্চার ক্ষেত্রে দুই ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথমটি হল উলম্বিক প্রসারণ (vertical expansion)। এক্ষেত্রে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চায় নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো, অনুভূমিক প্রসারণ (horizontal expansion)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তুলনামূলক রাজনীতি চর্চায় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আচরণবাদের প্রভাবে তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্র সাবিকে খোলস ত্যাগ করে আধুনিক বস্ত্র পরিধান করে। আচরণবাদের ফলে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক এককগুলিকে নতুনভাবে দেখতে শুরু করে। এক্ষেত্রে, কার্ল ডয়েশের (Karl Deutsch) যোগাযোগ তত্ত্ব (Communication Theory), স্নাইডারের (Richard Snyder) সিদ্ধান্ত

গ্রহণ তত্ত্ব (Decision Making Theory), বেন্টলের গোষ্ঠী তত্ত্ব (Group Theory), অ্যালমন্ড, কোলম্যান, হান্টিংটন ও ফ্রাঙ্কের উন্নয়ন এবং আধুনিকরণের তত্ত্ব (Development and Modernization Theory) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫০ সাল নাগাদ ডেভিড ইস্টন তাঁর *'Political System : An Inquiry into the State of Political Science'* (১৯৫৩) গ্রন্থের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গিকে হিসাবে সমালোচনা করে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন, যা 'General theory of politics' বা ব্যবস্থা-বিশ্লেষক দৃষ্টিকোণ (System Analysis Approach) নামেও পরিচিত। ডেভিড ইস্টন রাজনীতিক ব্যবস্থা (political system) দ্বারা রাষ্ট্রকে (State) প্রতিস্থাপন করেন। তিনি মনে করেছেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেকগুলি স্তর (Level) রয়েছে, যেমন স্থানীয় (local), জাতীয় (national) এবং আন্তর্জাতিক (international) স্তর। গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড (Gabriel Almond) এবং কোলম্যান (Coleman) তাঁদের *'The Politics of Developing Areas'* (১৯৬০) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে চর্চার স্বার্থে কাঠামো-কার্যবাদ তত্ত্ব (Structure Functionalism Theory) গড়ে তোলেন। অ্যালমন্ড এবং কোলম্যান মনে করেন, যে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একই ধরনের কর্ম সম্পাদন করতে হয় কিন্তু তারা এই কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করার স্বার্থে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো গঠন করে।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর দশকে বহু উপনিবেশ বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই, পূর্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার স্বার্থে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির বিশ্লেষণে বহু অংশে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাঠামো-কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চার্লস ডারউইন সর্বপ্রথম জীববিদ্যার ক্ষেত্রে কাঠামো-কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটান। তবে, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গাব্রিয়েল অ্যালমন্ড (Gabriel Almond) এবং কোলম্যান (Coleman) তাঁদের সম্পাদিত *'The Politics of Developing Areas'* (১৯৬০) গ্রন্থের মাধ্যমে কাঠামো-কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন করেন। অ্যালমন্ড এবং কোলম্যানের মতে, সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই একই ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হয়, তবে তারা এই কার্যগুলিকে যথাযথভাবে সম্পাদন করার স্বার্থে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো পরিগ্রহ করে। সুতরাং, যদি এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে কাঠামোর ভিত্তিতে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে কার্যের (function) ভিত্তিতে তুলনা করলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অ্যালমন্ড এবং কোলম্যান মনে করেছেন, প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই সাতটি সমধর্মী কার্য সম্পাদন করতে হয়। তারা এই সাতটি কার্যকে উপকরণ (input function) এবং উপপাদ (Output) নামে অভিহিত করে বর্ণনা করেছেন। তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি নানাভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে। এই পটভূমিতে ডেভিড ইস্টন তাঁর ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি (System Approach) গড়ে তোলেন। সাধারণভাবে, ব্যবস্থা বা System বলতে বোঝায়, যেখানে অনেকগুলি সত্তা (entity) থাকবে এবং প্রত্যেকটা সত্তার সঙ্গে প্রত্যেকটা সত্তার শনাক্তযোগ্য সম্পর্ক থাকবে। একটি সামাজিক ব্যবস্থার (social system) উদাহরণ হিসাবে ব্যক্তি (Individual), পরিবার (family) এবং প্রতিষ্ঠানের (Institutions) মধ্যেকার সম্পর্ককে বোঝানো হয়। এই সম্পর্কগুলি হল যোগাযোগ, প্রভাব, আনুগত্য, ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডেভিড ইস্টন ছাড়াও গাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও পাওয়েলের *'Comparative Politics : A Developmental Approach'* (১৯৬৬) এবং ডেভিড অ্যাপটার তাঁর *'Introduction to Political Analysis'* (১৯৭৭) নামক গ্রন্থে ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন। যাহোক, ডেভিড ইস্টন মনে করেছেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির থেকে আলাদা। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কার্য হল মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ (authoritative allocation of values in soceity)। ইস্টন তাঁর তত্ত্বে মূল্য (values) বলতে সেইসব সম্পদ (resource)-কে বুঝিয়েছেন, যা আমাদের জীবন গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, তিনি কর্তৃত্ব (authoritative) এবং বরাদ্দ (allocation) বলতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদগুলিকে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে যথাযথভাবে বিতরণ করাকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়,

এগুলি হল—(ক) উপকরণ (input) এবং (খ) উপপাদ (output)। তাছাড়া, এই উপকরণের দুটি ভাগ রয়েছে, যথা দাবি (demand) এবং সমর্থন (support)। এক্ষেত্রে দাবি বলতে সরকারকে কিছু নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করানোর দাবিতে গড়ে ওঠা জনমতকে বোঝায় এবং সমর্থন বলতে সরকার দ্বারা প্রণীত আইনগুলিকে মান্য করা, নিয়মিত কর প্রদান করা, ইত্যাদিকে বোঝায়। অন্যদিকে, উপপাদ বলতে কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তকে বুঝিয়েছেন। এই উপপাদগুলি (output) উপকরণগুলিকে (input) প্রভাবিত করে। জনগণ কিছু দাবি করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর এই উপপাদগুলি প্রতিক্রিয়া (feedback) সৃষ্টি করে অর্থাৎ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণ মতামত ব্যক্ত করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নতুন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা সিদ্ধান্তে পরিবর্তন করে।

রাজনীতি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং আলোচনার ক্ষেত্রে যোগাযোগ তত্ত্ব (Communication Theory) হল অপেক্ষাকৃত একটি নতুন তত্ত্ব। এটির জন্ম ডেভিড ইস্টনের 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' (Political System) থেকে। জার্মান রাষ্ট্রতাত্ত্বিক কার্ল ডয়েশ (Karl Deutsch) তাঁর *'The Nerves of Government'* (১৯৬৩) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সর্বপ্রথম যোগাযোগ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ডয়েচ তাঁর যোগাযোগ সম্পর্কিত মডেলটিতে Cybernetics অর্থাৎ সংবাদ আদান-প্রদানকারী এক স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত গণকযন্ত্র এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্রের শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত মতবাদের প্রয়োগ ঘটান। ডয়েশ মনে করেন, রাজনীতির মূল বিষয়বস্তু হল কতগুলি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমাজের মানুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়াস ও কার্যাবলী। সুতরাং, রাজনীতির মূল ক্ষেত্র হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার প্রয়োগ, যা যোগাযোগ তত্ত্বের মাধ্যমেই করা সম্ভব। যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার গুরুত্ব হ্রাস করে কিভাবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং কীভাবে তাঁর স্থায়িত্ব রক্ষা করে করার চেষ্টা করে সেই ব্যাখ্যা ডয়েশ তাঁর তত্ত্বে তুলে ধরেছেন।

সাধারণভাবে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হল, অনেকগুলি বিকল্পের মধ্য থেকে উপযুক্ত কতগুলি বিকল্পকে বেছে নিয়ে সেগুলিকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা লুসিয়ান পাই (Lucian Pye), রিচার্ড স্নাইডারের (Ricard C. Snyder), হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Lasswell), প্রমুখ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। লুসিয়ান পাই-এর মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একাধিক বিকল্পের মধ্যে থেকে কিছু বিকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য চিহ্নিত করতে হয়। রিচার্ড স্নাইডারের মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহায়ক। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যান্য প্রবক্তারা মনে করেন যে, শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই সিদ্ধান্তকে বিশ্লেষণ করাই রাজনীতিকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কেন অনেকগুলি বিকল্পের থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কিছু বিকল্পকে নেওয়া হল, কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কার্যপ্রক্রিয়া, সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করতে হবে।

তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনায় ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল গোষ্ঠী তত্ত্ব (Group Theory)। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদারনীতিবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বহুত্ববাদী উদারনীতিবাদের জন্ম এবং সেখান থেকেই গোষ্ঠী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। গোষ্ঠী তত্ত্ব রাজনীতি বিশ্লেষণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনার পরিবর্তে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আলোচনায় জোর দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা মনে করেন, রাজনীতির প্রকৃত কর্মকাণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং রাজনীতি হল গোষ্ঠীসমূহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হলেন আর্থার বেন্টলে (Arthur Bentley), ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman), ম্যাকরাইডিস (Macridis), প্রমুখ। আর্থার বেন্টলে তাঁর *'The Process of Government'* (১৯০৮) গ্রন্থে গোষ্ঠী তত্ত্ব সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন। তাঁর মতে, প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনার মাধ্যমে রাজনীতির প্রকৃতি চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই তিনি গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মাধ্যমে রাজনীতির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি তথ্য ও পরিমাপের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি গোষ্ঠীকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিস্থাপন করেন। তিনি মনে করতেন গোষ্ঠীসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ করলে সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সবকিছু জানা সম্ভব। ম্যাকরাইডিসের মতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের উপর গোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক

ব্যবস্থাটির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য, জনমত গঠন এবং জনমত গঠনের প্রক্রিয়া সহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হবে। তৎকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণে এই গোষ্ঠীতত্ত্ব সাফল্য লাভ করে, কিন্তু উন্নয়নশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণে গোষ্ঠী তত্ত্ব ব্যর্থ হয়।

১৯৫০-৬০-এর দশকের একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হলো আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল উন্নয়নের একমাত্র পথ পশ্চিমী আধুনিকীকরণ। সুতরাং, উপনিবেশ থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে উন্নয়ন করার স্বার্থে পশ্চিমী আধুনিকরণকে গ্রহণ করতে হবে। অ্যালমন্ড (Almond) ও কোলম্যান (Coleman) তাঁদের *'The Politics of the Developing Areas'* (১৯৬০) গ্রন্থে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তুলনা করে উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, ফ্রাঙ্ক (Andre Gunder Frank) তাঁর *'Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil'* (১৯৬৭) গ্রন্থে উন্নয়নশীল দেশগুলির অনুন্নত থেকে যাওয়ার কারণ হিসেবে পশ্চিমী শিল্পায়ন ও পুঁজিবাদকে দায়ী করেছেন।

১৯৬০ এবং ১৯৭০ সাল নাগাদ আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নানাভাবে সমালোচিত হতে হয়। সমালোচকরা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে 'Pure Science' হিসেবে সম্বোধন করে সমালোচনা করেন। তাদের মতে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক রূপে রাজনীতির আলোচনায় মানবতা (humanity) এবং আদর্শবাদী মূল্যবোধগুলোকে (normative values) অস্বীকার করে। উত্তর আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কিছু উপাদানের সমন্বয়ের মাধ্যমে আচরণবাদকে প্রতিস্থাপন করে এবং শাখাটিকে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অধিক গবেষণাধর্মী এবং যথাযথ করে তোলে।

1.4.3 নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে চর্চার স্বার্থে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্জন্ম হয়। সাবেকি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র লিখিত আইনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানগুলিকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করত। অন্যদিকে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ম (Norms), সংস্কৃতি (Culture), প্রথার (Custom) উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করে। এটি মনে করে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর ফলে, তুলনামূলক রাজনীতির চর্চায় 'Institutions matter'-এর ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে। মার্চ (March) এবং ওলসেন (Olsen) মনে করেছেন, নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি শাখা রয়েছে, সেগুলি হল সামাজিক (Sociological), যৌক্তিক পছন্দ (Rational Choice) এবং ঐতিহাসিক (Historical)। থেডা স্কোকপোল (Theda Skocpol) তাঁর *'Bringing the State back in'* (১৯৬৭) নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের সঙ্গে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যা নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রূপে বিবেচিত হয়। তবে, প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ এবং নয়া-প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করার স্বার্থে উভয়ের আলোচনার ক্ষেত্রগুলির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। নয়া-প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ এটা মনে করে যে, প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র শুধুমাত্র তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয় অর্থাৎ অধিকতর স্পষ্ট উপলব্ধির স্বার্থে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জড়িত নিয়ম-কানুন এবং রীতিনীতিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ শুধুমাত্র লিখিত আইন বা নিয়ম-কানুনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় বিশ্বাসী নয়। এটি সমাজের বিভিন্ন অলিখিত প্রথা, রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করে। এছাড়া নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি সাবেকি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনার অধিক স্পষ্টভাবে তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে, এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯৮০ সালের নাগাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলধারায় নয়া-প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের উত্থান ঘটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ, এই সময় দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজনীতির বিশ্লেষণে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির আধিপত্য থাকলেও তা ১৯৬০-এর দশকে আচরণবাদের প্রভাবে অনেকটাই খর্ব হয়। তবে, ১৯৮০ সাল নাগাদ তাত্বিকদের চিন্তাভাবনায় প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। ১৯৮৪ সালে জেমস্ জি. মার্চের (James G. March) *'New Institutionalism : Organisational Factor in Political Life'* (১৯৮৩) নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব সম্পর্কে জেমস্ জি. মার্চ (James G. March) এবং জোহান পি. ওলসেন (Johan P. Olsen) তাঁদের *'Rediscovering Institutions : The Organizational Basis of Politics* (১৯৮৯) গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। সাবেকি প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (Old Institutionalism) শুধুমাত্র লিখিত আইনের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠানগুলির চর্চা করতো, কিন্তু নয়া-প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (New Institutionalism) সংস্কৃতি, প্রথা, রীতিনীতির উপর ভিত্তি করেও প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্লেষণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি এটা মনে করে যে, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। যাহোক, হল (Hall) এবং টেলরের (Taylor) মতে, নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তত তিনটি শাখা রয়েছে, যথা, (ক) যৌক্তিক পছন্দ প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (Rational Choice Institutionalism) (খ) সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (Sociological or Cultural Institutionalism) (গ) ঐতিহাসিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (Historical Institutionalism)। যৌক্তিক পছন্দ প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তারা হলেন জর্জ সেভেলিস (George Tsebelis), বেরি ওয়েনগাস্ট (Barry Weingast) এবং মার্গারেট লেভি (Margaret Levi), প্রমুখ। এরা মনে করেন, একজন যুক্তিবাদী মানুষ সর্বদা নিজের সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ (maximize) করতে চায়, কিন্তু যদি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এরূপ আচরণ করতে শুরু করে তাহলে তা সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই, ব্যক্তির এরূপ আচরণ প্রতিহত করার স্বার্থে সমাজে প্রতিষ্ঠানের (institution) প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের প্রবক্তারা হলেন ডব্লিউ. ডব্লিউ. পাওয়েল (W.W. Powell) এবং পল জে. ডিমাগিও (Paul J. DiMaggio)। তাঁরাও তাঁদের *'The New Institutionalism in Organizational Analysis'* (১৯৯১) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের উপর আলোকপাত করেন। এরা একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যর ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করে। এরা মনে করে একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম এবং কাঠামোগুলি সংস্কৃতিকভাবে সৃষ্ট। এছাড়া, সমাজের উত্থান এবং পতনে নিয়ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হল (Hall) এবং টেলরের (Taylor) মতে, নয়া-প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের সব থেকে জটিল শাখা হল ঐতিহাসিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ। এই শাখাটিকে সংজ্ঞায়িত করা খুবই কঠিন, কারণ বহু তাত্বিক এবং বহু পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি (methodological approach) এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই শাখার কিছু গবেষক 'Path Dependence'-এর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। এক্ষেত্রে, এটা দেখা হয় যে, প্রতিষ্ঠানটির পূর্বতন বিবর্তন এবং পরিবর্তনগুলি কিভাবে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎকেও প্রভাবিত করবে। এই শাখার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের (Samuel P. Huntington) বিখ্যাত গ্রন্থ *Political Oder in Changing Societies'* (১৯৬৮), ব্যারিংটন মুরের (Barrington Moore) গ্রন্থ *'Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and Peasant in the Makingn of the Modern World'* (১৯৬৬) এবং থেডা স্কোকপোলের (Theda Skocpol) বিখ্যাত রচনা *'State and Social Revolutions'* (১৯৭৯)। অর্থনীতি থেকে উদ্ভুত যৌক্তিক পছন্দ তত্ত্ব (rational choice theory) তুলনামূলক রাজনীতিশাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের আলোচনার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটান উইলিয়াম রাইকার (William Riker)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম রাইকার রোচেস্টার স্কুলের (Rochester School) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাইকার ছাড়াও যৌক্তিক পছন্দ তত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তা হলেন অ্যান্টনি ডাউনস (Anthony Downs), প্রেজেওয়ার্সকি (Przeworski), প্রমুখ। অ্যান্টনি ডাউন্স গণতন্ত্রের উদারনৈতিক তত্ত্বের (economic theory of democracy) প্রবক্তা ছিলেন।

1.4.4 মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি

এটি মূলত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস যখন বলছেন, 'সমস্ত বাস্তব সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস' তখনই তিনি একপ্রকার তুলনামূলক বিশ্লেষণে নিজেকে নিয়োজিত করার কথা ঘোষণা করেছেন, কারণ এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমাজের শ্রেণীবিভাগ এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে সকল সমাজের শ্রেণী সংগ্রাম ঘটে সেটা প্রকাশ করার অনিবার্যতা ছিল। মার্কস আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের চরিত্র উন্মোচনে সর্বাপেক্ষা আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয়-বর্তমান' সমাজের ক্রম অগ্রগতি দেখানোর কাজে ব্রতী ছিলেন। এজন্য তিনি বিশেষ করে ভারত ও চীন সম্পর্কে তার জ্ঞান সমৃদ্ধ করেন। ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিকতার বিলম্বিত যুগ সম্পর্কে মার্কসের গবেষণায় যেমন ভৌগোলিক স্থান বৈচিত্র ছিল, তেমনই ছিল তার তুলনামূলক বিশ্লেষণের লক্ষ্য। মানুষ তার জীবনযাপনের সন্ধানে কেমনভাবে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে এই প্রশ্নের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তার ইতিহাসবোধকে সুসংগঠিত করার প্রয়াসে হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রকার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মার্কস যে ঐক্য সূত্রটি খুঁজে পান তাঁর নাম দেন উৎপাদনের প্রক্রিয়া বা Mode of Production। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যেকোনো দেশের ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মার্কস উল্লেখ করেছেন, উৎপাদনের শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে, মার্কস তাঁর তুলনামূলক আলোচনায় প্রযুক্তির তুলনায় সামাজিক সম্পর্কের উপর অধিক আলোকপাত করেছেন। স্টিফেন ওয়ার্নার মার্কসের বিভিন্ন গ্রন্থ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মার্কসের তুলনামূলক পদ্ধতির উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, মার্কসের রচনাবলী থেকে চার প্রকারের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এক্ষেত্রে প্রথমটি ভৌগলিক এবং পরবর্তী তিনটি ঐতিহাসিক একক।

1.5 তুলনামূলক রাজনীতির পদ্ধতিসমূহ

সাধারণভাবে, এটা বলা যায় পদ্ধতি (method) হল নিয়ামানুগ এবং প্রতিষ্ঠিত পথে কোনো কিছু সম্পন্ন করার একটি প্রক্রিয়া। ফিলিপ স্মিটার পদ্ধতিগত দিক থেকে তুলনামূলক রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, পদ্ধতি হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতি বিভিন্ন রাজনৈতিক এককের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব নির্মাণ, প্রকল্পের স্বার্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কার্য-কারণ সম্পর্ক অবধারণ করা, নির্ভরযোগ্য সর্বজনীন বক্তব্য গড়ে তোলা সম্ভব। ওয়েবস্টার (Webster) তুলনাকে 'পদ্ধতি' হিসাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, এটি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করে। তুলনামূলক রাজনীতি (comparative politics) শব্দটি কিবাবে এটা ব্যাখ্যা করলেও নির্দিষ্ট ভাবে বিশ্লেষণের পথটি নির্দেশ করে না। অন্যদিকে, বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিজফার্ট (Arend Lijphart) তুলনামূলক আলোচনায় তুলনাকে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। লিজপার্টের মতে, তুলনা অবধারিতভাবে একটি পদ্ধতিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা সম্ভব। এস. এন. আইজেনস্টাড্ট (Eisenstadt) বলেছেন যে তুলনামূলক পদ্ধতির শব্দটি ''সঠিকভাবে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে না, বরং সমাজের আন্তঃসামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, বা ম্যাক্রো-সামাজিক দিক এবং সামাজিক বিশ্লেষণের উপর বিশেষ আলোকপাত করে। হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল (Lasswell) যুক্তি দেন যে ''রাজনৈতিক ঘটনার প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ যে কারো জন্য একটি স্বাধীন তুলনামূলক পদ্ধতির ধারণা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, ''কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি ''অনিবার্যভাবে তুলনামূলক"। গ্যাব্রিয়েল এ. অ্যালমন্ড (Gabriel Almond) তুলনামূলকভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমতুল্য করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তুলনামূলক রাজনীতির কথা বলার কোন মানে হয় না যেহেতু এটি যদি একটি বিজ্ঞান হয় তবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটি তার পদ্ধতির তুলনামূলক। রিজফার্ট বলেছেন যে তুলনামূলক পদ্ধতি একটি অন্যতম মৌলিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়।

তুলনামূলক পদ্ধতি ছাড়া তুলনামূলক রাজনীতিতে প্রধানত তিনটি পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যথা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental method), পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical method), বিষয় ভিত্তিক অনুসন্ধান বা একক নমুনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি (case study)। এই পদ্ধতিগুলির মধ্য থেকে গবেষণার মূল বিষয় এবং পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি বা এক্সপেরিমেন্টাল পদ্ধতি (Experimental Method) দুটি সমরূপ একক বা গোষ্ঠী নিয়ে তাদের মধ্যে একটিকে পরীক্ষা (Experiment) করতে হবে (পরীক্ষামূলক গোষ্ঠী) এবং অন্যটিকে পরীক্ষার মুখোমুখি করতে হবে না (নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী)। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা (Experiment) এই একটি পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ উভয়কেই সম-অবস্থায় রাখতে হবে। পরীক্ষা হয়ে যাবার পর দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট দুটি একক বা গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু পরীক্ষার পর তাদের মধ্যে তুলনা করলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে এই পার্থক্যের কারণ পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট। এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে কতগুলি বিষয়কে ধরে নিয়ে ধরে নেওয়া হয়। প্রথমত, এমন একটি একক বা গোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া যাব যারা অবিকল একইরকম হবে; অন্ততপক্ষে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলিতে তারা উভয়েই সমরূপ। এই সমরূপ ফলে যে পরিবর্তনীয় পরীক্ষার ফলাফলকে বিভ্রান্ত করতে পারে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। 'যদৃচ্ছ বাছাই' (Random selection) বা সমকক্ষতার (Matching) নিরিখে এই উভয় একক বা গোষ্ঠীর সমরূপতা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষার প্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (Laboratory)। তৃতীয়ত, পরীক্ষার প্রকৃতি, পরিমাণ ও সময় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হবে। এই ধারণাগুলো বাস্তবে সম্ভব হলে, পরীক্ষার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Natural Science) ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বস্তুর উপর যতটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সমাজবিজ্ঞান কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বাস্তবিক এবং নৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি কার্যকারণ সম্পর্কের কাছাকাছি গেলেও আদর্শরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি পরীক্ষামূলক পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে একক বা 'Case'-এর সংখ্যা অধিক হওয়া প্রয়োজন তাদের মধ্যে পরিবর্তনীয় পার্থক্যগুলির সংখ্যায়িত বিশ্লেষণ বোঝার জন্য। অর্থাৎ পরিবর্তনীয় সমষ্টিগত পারস্পরিক সম্পর্ক বা একটি পরিবর্তনীয়ের সঙ্গে অপর একটির পারস্পরিক সম্পর্ক উভয়েই সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে নিরূপণ করা যায় এবং অপর যে সমস্ত উপাদানের প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলিকে সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যদি ধরা যায় আমাদের ভোটদানের প্রবণতাকে আমাদের শিক্ষা, জীবিকা এবং রাজনীতিতে আগ্রহের গভীরতা প্রবাহিত করে, তাহলে ভোটদানের উপর একদিকে এই তিনটি পরিবর্তনীয় সমষ্টিগত প্রভাব থাকবে ও অপরদিকে এগুলির এককভাবে উভয়ই সংখ্যায়িত করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে সমষ্টিগত (Macro) এবং এককগত (Micro) উভয় ধরনের তুলনাই সম্ভব। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সামাজীকরণ, নির্বাচনী আচরণবিধি প্রভৃতি আলোচনা করা যায়।

তুলনামূলক রাজনীতিতে বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি বা একক নমুনা বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে একটিমাত্র বিষয় বা একটিমাত্র দেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ এই পদ্ধতির সাহায্যে কেবলমাত্র একটি নমুনা বা একটি বিষয়ে সীমিত হয়ে গবেষণা করা হয়। এস. বার্নেসের *'Representation in Italy: Institutionalized Tradition and Electoral Choice'* (১৯৭৭), লিজফার্টের *'The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in Netherlands'* (১৯৬৮) প্রভৃতি গ্রন্থ এই ধরনের গবেষণা পদ্ধতির উদাহরণ। কিন্তু প্রশ্ন হল, একটিমাত্র দেশ গবেষণার উপজীব্য হলে, তাকে কি তুলনামূলক বলা যায়? একক ব্যবস্থা-কেন্দ্রিক যে আলোচনা তা একটিমাত্র ব্যবস্থার মধ্যেই সীমিত থাকে; সেজন্য তার যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব থাকে না। এই দিক থেকে বিচার করলে একক নমুনা গবেষণার স্থান চিহ্নিত করা কঠিন।

অর্থাৎ এই ধরনের গবেষণাকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যাবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। অপরদিকে 'নমুনার' কথা বলা হয় তখন স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায় যে নমুনা কোন সমষ্টির অংশমাত্র। নমুনা কখনোই এককভাবে অর্থবহ হয় না যদি আমরা কিসের নমুনা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়। যখন আমরা বলি, বৃষ্টি হবে বা বৃষ্টি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তকন আমাদের মনে বৃষ্টি হওয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে সেগুলি বিশেষভাবে ঘটমান। এই সূত্রটিই একটি নমুনার সঙ্গে সত্যিকারের একক ব্যবস্থার তুলনা করা সম্ভব। নমুনাভিত্তিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ সাধারণীকরণের সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত রাখে, যেখানে এককব্যবস্থার বর্ণনা সেই সম্ভানাকে অস্বীকার করে। আরেন্ড লিজর্ফাট ছয় ধরনের নমুনা ভিত্তিক বিশ্লেষণ বা বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির কথা বলেছেন। এগুলি হল—(ক) তত্ত্ব নিরপেক্ষ অনুসন্ধান পদ্ধতি (Atheoretical Case Study) এবং (খ) ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Interpretative Case Study), (গ) প্রকল্প সৃষ্টিকারী অনুসন্ধান পদ্ধতি (Hypothesis-generating Case Study), (ঘ) তত্ত্ব অনুমোদক (Theory-Confirming case studies) ও (ঙ) তত্ত্ব অননুমোদক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Theory-Infirming case studies) (চ) ব্যতিক্রমী অনুসন্ধান পদ্ধতি (Deviant case studies)।

তত্ত্ব নিরপেক্ষ অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিকে অনুসন্ধানভিত্তিক গবেষণার প্রকারভেদ হিসেবে দেখা উচিত নয় বলে অনেকেই মনে করেন। কারণ এই দুই ক্ষেত্রেই কোন প্রকার সাধারণীকরণের পরিবর্তে এককব্যবস্থার বর্ণনা বা ব্যাখ্যায় দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে একথা ঠিক যে বৈজ্ঞানিক জান সঞ্চয়ে এদেরও কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। এই দুইক্ষেত্রেই যে কোনো একক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে, যার মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অন্যদিকে যদি আমরা এটা মনে করি সম্পূর্ণ তত্ত্ব নিরপেক্ষ তথ্যসংগ্রহ করা অসম্ভব, তাহলে আমরা বলতে পারি যে তত্ত্ব নিরপেক্ষ এবং ব্যাখ্যামূলক মধ্যেও কিছু তত্ত্বের ধারণা থাকবে। বিশেষ করে ব্যাখ্যামূলক নমুনার ক্ষেত্রে, কারণ তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা সম্ভব এবং ব্যাখ্যা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তুলনাকে ব্যবহার করে। প্রকল্প সৃষ্টিকারী অনুসন্ধান পদ্ধতি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ এককের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা শুরু হলেও তার লক্ষ্য থাকে এক বা একাধিক সাধারণ প্রকল্প নির্মাণের প্রতি। যা পরবর্তী গবেষণার কাজে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লয়েড রুডল্ফ এবং সুশান এইচ. রুডল্ফ (Lloyd Rudolph and Susame H. Rudolph) তাঁদের, *'Modernity of Traditions: Political Development in India'* (১৯৬৭) গ্রন্থে একটি নির্দিষ্ট দেশ ভারতসম্পর্কে গবেষণার ভিত্তিতে একটি প্রকল্প গঠন করেছেন যেখানে আধুনিকতা ও সনাতনী ঐতিহ্য আপাতভাবে বিরোধী মনে হলেও একে অপরকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। তত্ত্ব অনুমোদক এবং তত্ত্ব অননুমোদক সাপেক্ষ অনুসন্ধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ এককে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হিসেবে ধরা হয় একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্তর্গত করে এবং ওই এককের অভিজ্ঞতার আলোকে তাত্ত্বিক কাঠামোটিকে বিচার করা এবং গ্রহণ বা বর্জন করার লক্ষ্য নিয়ে। এটা ঠিক যে একটামাত্র নমুনা একটি তত্ত্বকে গ্রহণ-বর্জনের ভিত্তি হতে পারে না। তবুও সেটি একটি উপযুক্ত উদাহরণের স্বীকৃতি পেতে পারে। স্যামুয়েল বিয়ারের *'British Politics in the Collective Age'* এইরকম একটি উদাহরণ যেকানে বিয়ার রাজনৈতিক কৃষ্টি ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক পরীক্ষা করেছেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রব্যবস্থার নিরিখে এবং দাবি করেছেন যে রাজনৈতিক কৃষ্টির বিশেষত্বের কারণেই ব্রিটেনে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। একই ধরনের গবেষণার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ফ্রাঙ্কলিন (Daniel P. Franklin) ও ব্যান (Michel J. Baun) সম্পাদিত *'Political Culture and Constitutionalism: A Comparative Approach'* (১৯৯৫) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে দশটি দেশ (নমুনা) সম্পর্কে অভিজ্ঞ দশজন লেখকের প্রত্যেকেই নিয়মতান্ত্রিকতাকে নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় এবং রাজনৈতিক কৃষ্টিকে স্বাধীন পরিবর্তনীয় ধরে নিয়ে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু যেহেতু দশটি দেশকে একত্র করে আড়াআড়িভাবে ওই পরিবর্তনীয় দুটির সম্পর্ক পরীক্ষা না করে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে দশটি দেশের আলোচনা করা হয়েছে সেজন্য এগুলি নমুনা-ভিত্তিক তত্ত্ব অনুমোদক গবেষণারই উদাহরণ। ব্যতিক্রমী অনুসন্ধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন একটি নমুনা বেছে নেওয়া হয় যেখানে কিছু বিশেষ অবস্থার উপস্থিতির ফলে সেই নমুনাটি কোন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা দশায় বা নেতিকরণ করে। ফলে

তত্ত্বের নির্ভরশীলতা সার্বজনীনতার পক্ষে এই ধরনের নমুনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জাতীয় গবেষণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ লিপসেট (Seymour Martin Lipset), কোলম্যান (James Coleman), ট্রয়ের (Martin Trow) বিখ্যাত গ্রন্থ *'Union Democracy: The Inside Politics of the International Typographical Union'* (১৯৫৬)। এই গ্রন্থে তারা দেখিয়েছেন কিভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি শ্রমিক সংগঠন (International Typographers' Union) রবার্ট মিচেলস প্রতিষ্ঠিত 'iron law of oligarchy'-র এবং অনুসন্ধান পদ্ধতির উদাহরণ। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য মিচেলস-এর 'Law' সর্বজনীনতা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। ব্যতিক্রমী নমুনার আরেকটি উদাহরণ হল লিজফার্টের নেদারল্যান্ডের উপর গবেষণা। তিনি দেখিয়েছেন ওলন্দাজ রাজনীতি ১৯১৭ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত গভীর সামাজিক বিভাজনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ঐ সময়কালে সেখানে একটি শক্তিশালী ও কার্যক্রম গণতন্ত্র বজায় ছিল, যদিও তত্ত্বগতভাবে ঐ ধরনের বিভাজন গণতন্ত্রকে অকেজো করে তুলবে বলে মনে করা হয়।

লিজফার্ট মনে করেন এই ছয় প্রকার এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রকল্পসৃষ্টিকারী অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং ব্যতিক্রমী অনুসন্ধান পদ্ধতি। যদিও আধুনিক তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একক ব্যবস্থার বিশ্লেষণকে তুলনামূলক রাজনীতির থেকে বাদ দেওয়ার প্রবণতা দেখান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের কাছেই তা এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে আছে। সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত গবেষণার দিক থেকে একক ব্যবস্থার অধ্যায়ন যথেষ্ট বাস্তবধর্মী।

যাহোক, তুলনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো সমস্যা হল বহু সংখ্যক চল (variables) এবং ক্ষুদ্র কেস বা এককগুলি। এই দুটি সমস্যাই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি গবেষকদের গবেষণায় বহু সংখ্যক চল (variable) থাকে, তাহলে কেসটির সমাধান করা অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। যাহোক, তুলনামূলক পদ্ধতির বহু চলগুলিকে (many variables) যথাসম্ভব ন্যূনতম করার জন্য চারটি সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলি হল কেসের সংখ্যাগুলিকে যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা, বিশ্লেষণের 'property space'-টি কমিয়ে আনা, তুলনার যোগ্য (comparable) কেসগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করা এবং 'মূল চল' (key variables)-গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

1.6 উপসংহার

তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় পদ্ধতির (method of studying comparative politics) গুরুত্ব অপরিসীম। তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক এককগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলি বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়। লিজফার্ট-এর মতে, সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার মৌলিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method)। অন্যদিকে, লাসওয়েল তুলনার পদ্ধতির গুরুত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, তুলনার কোনো আলাদা পদ্ধতি নেই, কারণ যেকোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেই তুলনা করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অ্যালমন্ড তুলনাকে পদ্ধতি (method) হিসাবে বিবচেনা করার পরিবর্তে দৃষ্টিভঙ্গি (approach) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। আচরণবাদী বিপ্লব তুলনামূলক পদ্ধতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে, এর ফলে এটি যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। ডেভিড ইস্টন, পাওয়েল, ডাল, প্রমুখের হাত তুলনামূলক পদ্ধতির চর্চা নানা জটিল বিষয় বিশ্লেষণে সফল হয়েছে। একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্র হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চা বহু সমালোচনার স্বীকার হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রটির সফলতা এবং কার্যকারিতার হারও নিতান্ত কম নয়। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে শিক্ষা, শ্রেণী পেশা, লিঙ্গ, ইত্যাদি সব বিষয়কেই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিগত কয়েক দশকে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চায় পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়, কারণ এটি পরীক্ষাগারের চার দেওয়ালের আবদ্ধ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে না। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষ, ইত্যাদি বিষয়কে পরিসংখ্যানের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে। তুলনামূলক পদ্ধতির

ব্যবহারের ফলে তুলনামূলক রাজনীতিশাস্ত্রে বহু সফলতা এলেও এটির বিরুদ্ধে কিছু সমালোচনা রয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সর্বদা যুক্তি মেনে অগ্রসর হয় না। তাই, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে যে তত্ত্ব গঠন করা হয়,তা সর্বদা সঠিক হয় না। বহু সমালোচকের মতে, তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনকে তুলনামূলক পদ্ধতি গুরুত্ব দান করে না। এছাড়া, তুলনামূলক পদ্ধতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার কিছু নির্দিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা করে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবশিষ্ট দিকগুলি অবহেলিত হয়। তুলনামূলক পদ্ধতি ধারণাগত একক নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। দেশ এবং কালের পরিবর্তন ঘটলে রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত ধারণার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এর ফলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, তা তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগকে বাধাপ্রাপ্ত করে। যাহোক, তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলেও এটা কখনোই বলা যায় না যে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয়। বরং এটা লক্ষ্য করা যায় যে, সাম্প্রতিককালে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের সামরিক বাহিনী, গণমাধ্যম, ধর্ম, বিরোধী দল, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চলছে। এছাড়া, এই দেশগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলের সদস্যপদের জন্য আগ্রহ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ের উপর তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আধুনিক কালে তুলনামূলক রাজনীতিতে তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহের ভিত্তিতে কিছু তত্ত্ব গঠন করা হয়েছে, এরূপ ঘটনা তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে।

সাধারণভাবে অর্থ এমন একটি নির্দিষ্ট ধারাকে বোঝায় যেখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা হয়। তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিভিন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব গভীরভাবে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রচলিত সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আদর্শমূলক, বর্ণনামূলক, মূল্যবোধযুক্ত এবং দর্শন, ইতিহাস, আইন এবং প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনায় অভ্যস্ত। অন্যদিকে, আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বিশ্লেষণমূলক, মূল্যবোধ নিরপেক্ষ, যেমন কাঠামো-কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি। আচরণবাদী বিপ্লবের ফলে তুলনামূলক শাস্ত্রের চিন্তাবিদদের দৃষ্টি রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে অনেকাংশে গিয়েছিল, তা নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি পুনরায় ফিরিয়ে আনে। মার্ক্সবাদী অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণীবিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূলত উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। দৃষ্টিভঙ্গিগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করে এবং এজন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মাধ্যমে কিছু প্রয়োজনীয় ধারণার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন সময়ে যেসব দৃষ্টিভঙ্গিগুলির উদ্ভব হয়েছিল তা সদ্য স্বাধীন দেশগুলির রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের হাওয়াকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। সুতরাং, এটা বলা যায় যে সমাজের অংশসমূহের পারস্পরিক ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সহায়তা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির কাজ হল সূত্রনির্মাণ, কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন, ইত্যাদি সম্পন্ন করা। পরিশেষে, এটা বলা যায় যে তুলনামূলক পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নানাবাবে একটি শাস্ত্র হিসাবে সমৃদ্ধ করেছে। অতীতে তুলনামূলক পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা ঘটবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিজ্ঞান, তাই সমাজের গতিশীলতা শাস্ত্রটিকেও পরিবর্তিত করে।

1.7 সারাংশ

- তুলনামূলক রাজনীতি কি এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ।
- তুলনামূলক সরকার এবং তুলনামূলক রাজনীতির মধ্যেকার পার্থক্যসমূহ।
- তুলনামূলক রাজনীতির পাঠের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ।

- তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় সাবেকি বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি।
- তুলনামূলক রাজনীতির চর্চায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব।
- তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য।
- তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব।

1.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

(1) তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রে পদ্ধতিসমূহের গুরুত্ব আলোচনা করো।

(2) তুলনামূলক রাজনীতি এবং তুলনামূলক সরকারের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।

(3) তুলনামূলক রাজনীতিতে কি কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়?

(4) তুলনামূলক রাজনীতিতে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি এবং নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আলোচনা করো।

(5) তুলনামূলক রাজনীতিশাস্ত্রে আচরণবাদের প্রভাব আলোচনা করো।

(6) তুলনামূলক রাজনীতিশাস্ত্রে আচরণবাদী এবং মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মৌল বৈশিষ্টগুলি আলোচনা করো।

(7) তুলনামূলক রাজনীতিতে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আলোচনা করো। নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাবেকি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।

1.9 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

(a) Chatterjee, R. (2014). *Introduction to Comparative Political Analysis.* Sarat Book House.

(b) Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2019). *Comparative Government and Politics: An Introduction* (11th ed.). Red Globe Press.

(c) Lijphart, A. (2008). *Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice.* Routledge.

(d) Newton, K., & Deth, J. W. (2010). *Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World* (2nd ed.). Cambridge University Press.

(e) Powell, G. B., Strom, K., Manion, M., & Dalton, R. J. (2015). *Comparative Politics Today: A World View* (12th ed.). Pearson.

(f) Rakner, L., & Randall, V. (2011). Institutional Perspectives. In P. Burnell, V. Randall, & L. Rakner (Eds.), *Politics in The Developing World* (3rd ed.) (pp. 53-69). Oxford University Press.

(g) Ray, S.N. (2004). *Modern Comparative Politics: Approaches, Methods and Issues*. PHI Learning

C.C : 3.1

Unit-2

Media, Communication and Political Culture

Content :

2.1 Objectives

2.2 Introduction

2.3 Mass Media and its importance in developing countries

2.3.1 Characteristics of Mass Media

2.3.2 Functions of Mass Media

2.4 Mass Communication

2.4.1 Advantages of Mass Communication

2.5 Political Culture

2.5.1 Classification of Political Culture

2.5.2 Features of Political Culture

2.6 Mass Society, Political Culture and Developing Countries

2.7 Democratisation: Role of media, communication and political culture in Developing countries

2.8 Concluding observations

2.9 Self assessment questions

2.10 Suggested readings

2.1 Objectives

- To learn about the importance of mass media in developing countries.
- Learn about different types of political culture.
- Learn about the process of democratization in developing countries.

2.2 Introduction

Media is a vehicle or means of communication that disseminates information from the source to the target public and any media intended for the larger audience is called mass media. From pictorial representations in the early age, massive production of newspapers, fancy videos on television to high-tech media combining the Internet and computers, there are variations in the type of mass media. Communication is a process in which a person is conveying a message to another person. Exchange of information and knowledge takes

place through communication where there is a sender who conveys the message, and there is a receiver who receives the message/information. Political culture means the overall norms, values, belief or orientation towards politics in the society. The concept of political culture is changing oriented, but this is change slowly. Persons' perceptions change as new experiences unfold. Depending on the city-life experiences of people coming from village to city and living in the city, there are rapid changes in attitudes. But cultural attitudes or values change very slowly. Hence, the attitude towards political action reflects fairly permanent aspects of political culture.

You will, through this article, learn about the different types and importance of mass media, communication and political cultures in developing countries.

2.3 Mass Media and its importance in developing countries

The modern mass media are recognised as potentially powerful "conduits" of public opinion and "watchdogs" of public probity. Certain commentators suggest that they could contribute to the "public sphere" in modern and "modernising" states by providing citizens with a serious forum in which to debate those substantive issues which most affect them.

However the media are also susceptible to social and political actors and agencies who seek to manipulate and control them. Developing governments in particular frequently appear anxious to harness the "power of the press". Journalists are exhorted to work towards "national unity", to respect "national security" and to eulogise government "development projects"; conversely they are expected to downplay negative criticism of the government and its supporters and of "sensitive issues"'. The ideal media in such a formulation are not encouraged to hold the state's public servants and private overlords to account; rather, they should become a "development tool" of government, articulating the "common goals" of "national economic development".

The tension between these mutually conflicting views of the media's place in civil society – as "watchdog" of ruling elites, or their mouthpiece - is often at the heart of attempts to defend, or gag, "press freedom". Can the media realistically be expected to "defend democracy", or are they simply one arm of Althusser's Ideological State Apparatuses, manipulating audiences and public opinion even as they themselves are constrained by hegemonic forces? Can the media, in other words, ever act with "relative autonomy" from elite and state interests, and if so, under what circumstances? In whose differing class interests do the personnel at various levels within media hierarchies act? What effect, if any, do the media have on political and economic processes in developing countries?

To put it simply, Mass Media can be defined as a technology which is intended to communicate or reach a mass audience. In doing so, it could play the role of an ISA to expand the ideology of the ruler or could be used as the arm of the masses to overthrow the autocratic ruler and helps establishing democracy. Mass media is actually the primary means of communication for the general public to communicate with each other as well as on a grander level. The most popular types of mass media include Newspapers, Radio, Television, Internet, Magazines and more! Media means of public communication reaching a large audience through verious media liks news paper, television, digital platforms like social media etc.

When it comes to the different forms of media, there are varied formats of modern media such as print media (newspapers, books, magazines), broadcast media (television, radio), digital media (internet) as well as video games, music, cell phones, films, amongst others. All these types of mass media comprise content as well as a device or object which is the medium for delivering the content. There are six main types of Mass Media: Traditional Media, Print Media, Electronic/Broadcasting Media, Outdoor Media or Out of Home Media (OOH), Transit Media, Digital Media/New Media/Internet.

Whenever you want to listen to your favourite music, watch the latest movie, an event or a cricket match, where do you go? While earlier, television was the only source, the modes of staying updated with the happenings around you have expanded. Here are the most common examples of Mass Media: Television, Radio, Newspapers, Magazines, Social Media, Digital media, The internet, etc

These sources of disseminating information and news are considered 'mass media'. It is a medium that is used to communicate with the masses or a large number of heterogeneous audiences different kinds of information.

2.3.1 Characteristics of Mass Media

Mass Media comprises a wide range of media technologies to disseminate or reach over a larger audience through mass communication. The major characteristics of Mass Media are:

- Mass Media constitutes both technical and institutional methods for communication, production and dissemination of news.
- It reaches larger audiences or masses and that's why is referred to as mass media. Mass Media has the power to influence society and is also impacted by what's happening in society itself.
- Audience or the masses are offered with a wide variety of choices in terms of content, media platform, etc. to choose from the type of mass media they want to consume.

2.3.2 Functions of Mass Media

- Mass media has been one of the most significant forces in modern culture. All types of mass media communication whether written, broadcast or spoken reach a larger audience thus creating a massive impact. Here are the important functions of Mass Media:
- Mass media plays a crucial role in shaping how we view the world. Intensive use of mass media has resulted in the world to appear smaller and closer. It also promotes the distribution of goods and services.
- The fundamental objectives of mass media are to inform, educate and entertain the masses.
- It is known to be an important player in democracy and the smooth functioning of the nation.
- Media is the watchdog of society and politics.
- Mass media works to transmit heritage and cultural values.
- The rise of new mass media creates a global platform to bring people together.

2.4 Mass Communication

Mass Communication refers to the process of disseminating and exchanging information through diverse media platforms to reach the masses. Mass Communication is different from Mass Media because various forms of mass media like TV, Radio, the Internet, Print Media, Outdoor Media, etc. are used to facilitate mass communication, i.e. communicate certain information to the masses.

The most common types of Mass Communication are: Journalism, Social Media, Films, Television, Radio, Advertising, Public Relations, Books, Magazines, Newspapers and Journals, Photography, Audio Media like Community Radio, Podcasts, Interactive Media like websites, video games, digital ads, etc.

2.4.1 Advantages of Mass Communication

There are numerous advantages of mass media in the contemporary world. From being the watchdog of a democratic country to ensuring faster communication, different types of mass media have various advantages and benefits such as:

- Effective and Wider Communication - It is through different types of mass media from social media to the digital platforms that the world has transformed into a global village. This way, mass communication has become useful for the people, businesses, governments and the whole world to stay connected with each other.
- Giving Voice to the Voiceless - Mass media plays an essential role in shining the spotlight on the masses as the general public can express their views and opinions freely. This way, it becomes the voice of the voiceless thus giving the right platform for the people to use their right to express freely.
- Diffusion of Diverse Cultures - Mass media also plays a colossal part in spreading arts and cultures to every nook and corner of the world. With the help of the internet, anyone can learn a new language, know about a different culture or even travel the whole world without physically going from one place to another.
- Encyclopedia of Information - The internet is truly a massive open source of information and different types of mass media from search engine platforms to social media platforms and learning websites play a greater role in helping anyone learn anything anywhere. Apart from these, there are certain disadvantages of mass media such as easier spread of fake news, compromised privacy, health issues, glamorizing censored content and topics, possibility of fraud and hacking, amongst others.

2.5 Political Culture

R.C. Macridis writes of it as “the commonly shared goals and commonly accepted rules.” Robert A. Dahl has singled out political culture as a factor explaining different patterns of political opposition whose salient elements are:

1. Orientations to problem-solving; are they pragmatic or rationalistic?
2. Orientations to collective action; are they cooperative or non-cooperative?
3. Orientations to the political system; are they allegiant or alienated? 4. Orientations to other people; are they trustful or mistrustful?

Lucian W. Pye has studied the meaning of political culture in the context of his concept of political development relating to the case of new states of the Developing or developing nations. He defined a political culture as the set of attitudes, belief and sentiments which give order and meaning to a political process and which provides the underlying assumption and rules that govern behavior in the political system, which encompasses both the political ideas and the operating norm of a polity.

Thus, political culture may be described as "a short-hand expression to denote the emotional and attitudinal environment within which the political system operates." Borrowing from Talcott Parsons, we "can be a little more precise at this point and say that we are concerned with orientations towards political objects. Orientations are predispositions to political action and are determined by such factors as traditions, historical memories, motives, norms, emotions and symbols." It is obvious that the concept of political culture finds place in the subjective realm. According to Almond and Powell, "such individual orientations involve three components — (i) cognitive orientations implying knowledge, accurate or otherwise, of the political system, (ii) affective orientations implying feelings of attachment, involvement, rejection, and the like about political objects, and (ii) evaluative orientations implying judgments and opinions about the political objects, which usually involve applying value standards to political objects and events."

2.5.1 Classification of Political Culture

History, geography, political traditions and customs, political specialisation process etc. are the basic determinants of the political culture. Depending on these determinants Political culture can be classified. Almond, Powell, Verba, Finer are the exponent of the development of the concept. Following them Political culture can be classified in to three categories.

1. Participatory - The degree of public involvement in politics and in organizations such as churches, business and unions and political parties. In a participant political culture, like the United Kingdom and the United States, citizens are informed and actively participate in the political process.
2. Parochial- here the individual hardly relate himself to politics and is unaware of its existence as I traditional society. In a parochial political culture, like Mexico, citizens are mostly uninformed and unaware of their government and take little interest in the political process.
3. Subject- this exists in countries where the citizens have passive or obedient relationships to the system as in Eastern Europe. In a subject political culture, such as those found in Germany and Italy, citizens are somewhat informed and aware of their government and occasionally participate in the political process.

However one can hardly find the ideal form of political culture, specifically, in any country. Thus Almond,

Verba presented the notion of mixed culture. It can be participant- parochial, parochial-subject, participant-subject and mixed or civic culture.

2.5.2 Features of Political Culture

1. The views of the people regarding the world of politics are the subject of political culture, but not the various events organized in world politics. So it can be called the psychological dimension of politics.
2. In the political culture, the attitude of both the political ideal and the effective system of the state is expressed.
3. It consists of empirical concepts of political life and values that are worth pursuing in political life, and they can be emotional, perceptive.
4. If there is a kind of attitude among the people about important political issues in the political culture, then there is political stability. It is easy to get rid of the crisis if people's attitudes are favourable to political institutions during the crisis period of the country.
5. Political culture does not remain unchanged. It is also constantly reorganized in terms of cultural change in society. With the arrival of foreigners to live, the revolution, the war, or any other major change can completely change the political culture of a state.

The interaction between the political system and the political culture is very close. There can be broad consensus among the people regarding the existing political system and its basic structure. In that case, the political system is strong and stable. On the contrary, the structure of the existing political system, with disagreement among the people in the context of the tasks, poses a serious hostility to the political system. As a result, the foundation of that political system weakens. In any country's political system, political culture is regarded as important. The political values, beliefs and attitudes of the country or nation are reflected through the political culture. Social

culture is especially important in people's social lives. Similarly, the importance and significance of the political culture of the people is immense.

2.6 Mass Society, Political Culture and Developing Countries

Through the works of Mannheim we came to know about the expression 'mass society.' Mass society, as depicted by Kornhauser, refers to a social system in which elites are readily open to influence by non-elites. Simultaneously, non-elites (in particular, those occupying marginal positions in society) are also highly available for mobilization because they lack attachments to independent groups, the local community, voluntary associations, and occupational groups. Social conditions resemble a 'mass society' when populations and elites can emotionally incite one another to extreme actions. With the advent of modernisation and technological advancement mass media played an important role in many developing societies to these kind of situation and influence the masses.

On the other hand in developing countries societal transformation is a major issue of concern in which information is the key resource. So the notion of information society is important in this regard. As the creation, distribution, use, integration, and manipulation of information is a significant economic, political, and cultural activity in developing societies, as there is a tendency to follow copy cat method of development of developed nations. In this era of transformation media became an important driver to build the political culture of the developing societies taking cue from the notion of information society.

2.7 Democratisation: Role of media, communication and political culture in Developing countries

In most the authoritarian regimes political culture developed by using mass society through various state controlled media. Communication been made in a projected or planned way. The authoritarian rulers are being depicted as the messiah. The regimes of Mugabe in Zimbabwe, Saddam Husain of Iraq, Hosni Mubarak of Egypt, Gaddafi of Libya are the burning examples of the statement. However in most of the cases Mass media and Social media was the driving force to develop the coup against the rulers. If we take the example of Egypt we could learn that social media was the only platform which was used to generate public awareness and assemble people to form the coup. It is interesting to find out that the rulers were being overthrown from the power for the sake of Democracy. Thus mass media as a product of democracy plays pivotal role in establishing voice of the voiceless.

This is chiefly because many discussions about the media, and their indispensibility for democracy, hinge on the assumption that one of the media's major roles is performing the so-called "watch-dog" function: to provide information and critiques on the accountability of state and private decision-makers to the electorate.

Yet democracy may involve more than formal political structures - of government, opposition, electoral party politics and legal institutions. If it is to include notions of "empowerment", for instance, then the public may develop other expectations of its media beyond the "watchdog" role. These might entail the provision of networks and outlets for marginalised "voices", and for alternative political programmes, for example. Such networks may be both formal and informal, within "civil" as well as "political" society". It is this relatively new demand to "voice out" and "be heard" from hitherto marginalised social groups, especially in the Third World, which may well constitute one of the key indicators of a real "deepening" of democratic forces.

The fundamental issue here is not, as some "realists" claim, a mutually exclusive choice between "representative democracy" and "direct democracy", though it is often caricatured as such. Rather, any analysis of the development of democracy within the nation state – and of the "public sphere", which is one site of that development - should include an examination of public responsiveness. Questions central to this concept can then be considered: which political institutions, social agencies and actors are capable of responsiveness, and in whose interests; to what political stimuli - for example, crisis or mobilisation, parliamentary, "public" or media debate - are they responding, and to whose agendas; and, finally, what political outcomes do their responses have?

Thus when “representative democracy” assumes the elitist mantle of top-down decision-making, without reference to the wishes of those below, populist rhetoric cannot disguise the fact that the decisions taken are for the convenience and benefit of certain segments and class actors of society. Conversely if citizens - both majorities and marginalised minorities - are enabled to “voice out” their needs, and their agendas are reported within the “public sphere” and acted upon, the potential for the eventual development towards a more “responsive democracy” is increased concomitantly.

The mass media may distort, suppress or ignore such voices, or they may try to represent them. Whether even genuine attempts at accuracy of representation can lay claim to “truth” and “balance” in any “objective” sense, is a vexed question both inside and outside the media profession. It may well be that distortions are embedded structurally within the systems of media representation currently employed, such as news-gathering formats, reporting and editing practices, and the constraints acting upon them. This debate also connects with broader questions of epistemology and ideology and their relation to political discourse.

Suffice it here to note that if the messages, however “accurate”, are ultimately ignored, drowned out, manipulated or deflected, the media cannot really be said to be contributing a great deal to substantive democracy. Media roles must therefore also be considered in conjunction with broader political outcomes which affect democratisation. These may include, for example, changes in the political institutions and ‘’ the economic policies promulgated by particular regimes, together with longer-term transformations which may result therefrom, such as alterations in the overall composition of social classes and their relative political power.

Furthermore it is necessary to be precise about which media are under consideration. It may not always be the mass circulation print or broadcasting media which make the greatest contribution to addressing issues of public concern. The role of environmental lobby groups like “Greenpeace” and “Friends of the Earth” in engaging public opinion on environmental issues in Britain is a case in point. They have promoted their agendas through not only the mass media but also through their own activising campaigns and “micro” media, including newsletters, publicity, press releases, and other public forum. These tactics are now being paralleled increasingly by the strategies of concerned social groups - often referred to collectively as “cause-oriented groups” - in countries like the Philippines, India, Bangladesh and many Developing countries, mostly democratic.

When it come to the role of Social media as the mean in developing societies one could find various ways to use the same to serve their political interest. Social media can be used in electoral marketing at three levels: local elections, general/parliamentary elections, and presidential elections. Despite having differences from political cultures and system social media provides the people an equivalent platform to present their narratives. One should also understand that there are variances in the use of social media at local and national political levels. The political institutions may have common ground principles, but their organization and actors, and their proximity with voters, are determinant to the ways in which social media are used.

The use of social media in mobilizing people for riots and revolutions is another form which helps to scrutinse the democratisation process and rights of the people. Examples from Egypt, Turkey, South Africa,

Israel, India can be presented and analyzed to justify the statement. In spite of the focus on social media use in civic participation, studies in this part also emphasize ethical concerns, censorship, and human rights violations.

Digital technologies hold great promise for democracy. Social media tools and the wider resources of the Internet offer tremendous access to data, knowledge, social networks, and collective engagement opportunities, and can help us to build better democracies. Unwelcome obstacles are, however, disrupting the creative democratic applications of information technologies. Massive social platforms like Facebook and Twitter are struggling to come to grips with the ways their creations can be used for political control. Social media algorithms may be creating echo chambers in which public conversations get polluted and polarized. Surveillance capabilities are outstripping civil protections. Political "bots" (software agents used to generate simple messages and "conversations" on social media) are masquerading as genuine grassroots movements to manipulate public opinion. Online hate speech is gaining currency. Malicious actors and digital marketers run junk news factories that disseminate misinformation to harm opponents or earn click- through advertising revenue.

It is no exaggeration to say that coordinated efforts are even now working to seed chaos in many political systems worldwide. Some militaries and intelligence agencies are making use of social media as conduits to undermine democratic processes and bring down democratic institutions altogether. Most democratic governments are preparing their legal and regulatory responses.

2.8 Concluding observations

In most of the developing countries media, communication and political culture are playing the role of major determinant of 'manufacturing consent' or even manufacturing decent. Whatever be the case is, today digital platform became such a forum by which people can participate using the digital mode of communication to express their views. Political culture of today's world much deepens and became more participative in developing world.

Since we are living in Globalised world which is largely influence and dominated by market economy the goal orientation, agenda setting, political communication are being manufactured. Vested interest of the investors has to be served by the governments. Thus the roles of media in communicating the democratic information or generating the values of representative democracy are being neglected in a large scale. Still developing a participatory political culture using various means of communication is always plays pivotal role in modern developing countries.

2.9 Self Assessment Questions

(i) Write a detailed note on characteristies and functions of mass media in developing countries.

(ii) What is political culture? Discuss about different types of political culture.

(iii) Explain the role of communication and political culture in developing countries?

2.10 Suggested Readings

(a) Basu, P. (Ed.). (2015). *Political Sociology.* Setu Prakashani.

(b) Chakraborty, S. (Ed.).(2005). *Political Sociology*. Macmillan India.

(c) Hague, R., Harrop, M., & Breslin, S. (1992). *Comparative Government and Politics: An introduction* (3rd Ed.). Macmillan.

(d) Mukhopadhyay, A.K. (1977). *Political Sociology: An Introductory Analysis.* K.P. Bagchi & Company.

পাঠক্রম : ৩.১

Unit-3

Political Participation, Political Institution and State of Democracy

(রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও গণতন্ত্র)

বিষয়সূচি :

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 ভূমিকা

3.3 রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

3.4 রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : সংজ্ঞা ও ধারণা

3.5 রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রকারভেদ

3.6 রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহার কারণ

3.7 রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

3.8 গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

3.9 উপসংহার

3.10 সারাংশ

3.11 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

3.12 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

3.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কী?
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রকারভেদ
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহার কারণ
- গণতন্ত্রের সাথে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্পর্ক

3.2 ভূমিকা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পৃথিবীর যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অগ্রগতি নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষের অংশগ্রহণ এবং সেই ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রদর্শনের উপর। সে কারণে সনাতন অথবা আধুনিক গণতন্ত্র কিংবা কর্তৃত্ববাদী একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা; যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। তবে একটি উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের যে স্বাধীন সুযোগ থাকে কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেই

প্রেক্ষিতে কর্তৃত্ববাদী একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিত্রটা ঠিক উল্টো। কোনো কর্তৃত্ববাদী, একনায়কতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থনকে সুনিশ্চিত করা। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সরকারের বা বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার পিছনে জনসমর্থনকে সুনিশ্চিত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার কর্তৃত্বকে বৈধতাযুক্ত করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বকে অনেকখানি সুনিশ্চিত ও নিরাপদ করে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা বা হার কোনোভাবে কম হলে যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লব বা বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকে। সে কারণে যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

3.3 রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে জনগণের অংশগ্রহণের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। তবে ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের ধারণার বিকাশ গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন গ্রিসের এথেনীয় গণতন্ত্রে নগররাষ্ট্রের কার্যকলাপে নাগরিকরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করত। তবে গ্রিক নগর রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের প্রকৃতি মোটেই সার্বিক ছিল না। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত সমাজের মুষ্টিমেয় অংশ। সমাজে নারী, দাস এবং বিদেশিদের অংশগ্রহণের কোনো অধিকার ছিল না। পরবর্তী বিশাল রোমান সাম্রাজ্যেও শুধুমাত্র রোমে বসবাসকারী নাগরিকরাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারত।

মধ্যযুগ পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নবজাগরণ (রেনেসাঁস) ও তার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাত ধরে গণতন্ত্রের আধুনিক ধারণার উন্মেষ ঘটে। নবজাগরণ পরবর্তী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার অর্জনের জন্য রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করে। উদারনীতিবাদ এর প্রভাবে বিকাশ লাভ করে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পাশাপাশি নগররাষ্ট্রকেন্দ্রিক ব্যবস্থার আয়তন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে উদ্ভব হয় আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং বিকাশ লাভ করে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে উদ্ভব ঘটে সংসদ, নির্বাচনী ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, ভোটাধিকার, স্বার্থ গোষ্ঠী প্রভৃতি নানান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ার। প্রাথমিক ধাপে ভোটাধিকার সীমিত থাকলেও পরবর্তীকালে নানা আন্দোলনের মাধ্যমে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই রাষ্ট্রতাত্ত্বিকগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাকে তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এর ধারণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকের পরবর্তীকালে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিকদের দ্বারা। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অ-অংশগ্রহণমূলক বিশ্লেষণ ধারার অন্যতম প্রধান দুজন তাত্ত্বিক হলেন চার্লস মেরিয়াম ও হ্যারল্ড গসলেন।

3.4 রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : সংজ্ঞা ও ধারণা

সাধারণভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে বলা যায়, রাজনৈতিক কার্যকলাপে মানুষের অংশগ্রহণ, যেখানে মানুষ সমাজের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সাথে বিশেষভাবে জড়িত থাকে। তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এর ধারণার নির্দিষ্টভাবে কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন।

হার্বার্ট ম্যাকক্লস্কি তাঁর 'Political Participation' প্রবন্ধে বলেছেন-রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে সাধারণভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় সম্পাদিত কিছু কার্যাবলীকে বোঝায়। যেগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যেমন শাসকদের নির্বাচন বা সরকারের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

লুসিয়ান পাই তাঁর *Aspects of Political Development* (১৯৬৬) গ্রন্থে বলেছেন, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া।

সিডনি ভার্বা ও নর্ম্যান নাই তাঁদের *Participation in America : Political Democracy and Social Equality* (১৯৭২) গ্রন্থে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে বুঝিয়েছেন, যা সমাজের সদস্যরা স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে থাকে এবং যার মাধ্যমে তারা শাসককে নির্বাচিত করে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় ও তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

স্যামুয়েল হান্টিংটন এবং জোয়ান এম. নেলসন *No Easy Choice* (১৯৭৬) গ্রন্থে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে নাগরিকদের সেইসব ক্রিয়াকলাপকে বুঝিয়েছেন, যার উদ্দেশ্য হলো সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা।

অ্যালমন্ড ও পাওয়েল তাঁদের *Comparative Politics : A Developmental Approach* (১৯৬৬) গ্রন্থে বলেছেন, উপকরণ কাঠামো ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত এবং চাহিদা প্রকরন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

মাইকেল রাশ তাঁর *Politics & Society : An Introduction to Political Sociology* (১৯৯২) বলেছেন, রাজনৈতিক স্তরে ব্যক্তির যোগদানই হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, যার পরিসর বিনা অন্তর্ভুক্তি থেকে সরকারি কার্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

আলী আশরাফ ও এল. এন. শর্মা তাঁদের *Political Sociology : A New Grammar of Politics* (১৯৮৩) গ্রন্থে বলেছেন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো সেইসব কার্যাবলী যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

অ্যালমন্ড ও ভার্বা তাঁদের *The Civic Culture* (১৯৬৩) গ্রন্থে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পিছনে কিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এর কথা বলা যায়। যার মাধ্যম মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়। কাজেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ফল হয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলো একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া হল সেই সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

3.5 রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রকারভেদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় পূর্বে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে মূলতনির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকেই বোঝানো হত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নির্বাচনে ভোট প্রদান, নির্বাচনী প্রচার, রাজনৈতিক সভায় যোগদান, রাজনৈতিক দলের প্রচারপত্র বিতরণ প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাকে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন বর্তমানে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার বিষয়টিও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রকারভেদ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গভীরতা, তীব্রতা, উদ্দেশ্য, নাগরিকদের মনোভাব প্রভৃতির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) গভীরতা ও তীব্রতার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গভীরতা ও তীব্রতার বিচারে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ—সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে যুক্ত থাকাকে বোঝায়। যেমন, দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কিংবা দলীয় পদে আসীন থাকা ইত্যাদি। উল্লেখ্য সমাজের খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করে থাকে।

(খ) নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ—সমাজের বেশিরভাগ মানুষজনের সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের সময়, সামর্থ্য বা ইচ্ছা থাকে না। যারা মূলত দর্শকধর্মী ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকে। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক কাজকর্মকে নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলা হয়ে থাকে।

(২) উদ্দেশ্যগত বিচারে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :

উদ্দেশ্যগত বিচারে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) সহায়ক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ—সহায়ক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হন। যেমন—রাজনৈতিক দলের সাফল্য লাভ, কোনো রাজনৈতিক নেতার প্রভাব বা মর্যাদা বৃদ্ধি, আইনসভায় কোনো নির্দিষ্ট বিল পাস ইত্যাদি।

(খ) অভিব্যক্তিমূলক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ—অভিব্যক্তিমূলক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য থাকে না। মূলত তাৎক্ষণিক কোনো সন্তুষ্টি লাভ বা অনুভূতি এর পিছনে কাজ করে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভোটদাতা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলীয় প্রার্থীর বা দলের সাফল্যের জন্য ভোট দেন না, শুধুমাত্র তাঁর মানসিক সন্তুষ্টির জন্যই সে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

(৩) সরকারের প্রতি নাগরিকদের মনোভাবের প্রকৃতির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের আধুনিক আলোচনায় সরকারের প্রতি নাগরিকদের মনোভাবের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) সমর্থনসূচক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ—এক্ষেত্রে সরকারের প্রতি সমর্থনসূচক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে এই ধরনের অংশগ্রহণের অভিব্যক্তি ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শাসকদলের মিটিং মিছিলে যোগদান কিংবা সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনায় যোগদান ইত্যাদি।

(খ) প্রতিবাদমূলক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ—নাগরিকরা যখন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বা কোনো ভাবে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করার ক্ষেত্রে বাধ্য করার জন্য যেসব উপায় পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলিকে প্রতিবাদমূলক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে প্রতিবাদী আন্দোলন, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম কিংবা কোনো হিংসাত্মক কার্যকলাপের কথা বলা যায়। তবে প্রতিবাদী রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কোন কোন কাজকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে সে বিষয়ে মতের ভিন্নতা রয়েছে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপরিউক্ত প্রকারভেদ-এর পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।

রাষ্ট্রবিজানী রাশ ও আলথপ তাঁদের *An Introduction to Political Sociology* গ্রন্থে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা ও বিস্তার বিচারে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্রিয়াকলাপের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তালিকাটি হল—(১) রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পদে আসীন থাকা, (২) রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পদগুলি পাওয়ার চেষ্টা, (৩) কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্যপদ, (৪) কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের নিষ্ক্রিয় সদস্যপদ, (৫) স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কোনো আধা-রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যপদ, (৬) কোনো আধা-রাজনৈতিক সংগঠনের নিষ্ক্রিয় সদস্যপদ, (৭) জনসভা, মিটিং-মিছিল প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ, (৮) ঘরোয়া কোনো রাজনৈতিক আলোচনার যোগদান, (৯) রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ অংশগ্রহণ, (১০) ভোটদান, (১১) উদাসীনতা।

উডওয়ার্ড ও রোজার তাঁদের 'Political Activity of American Citizens' প্রবন্ধে পাঁচ ধরনের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে। যথা—(১) নির্বাচনে ভোট দান, (২) কোনো নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর সদস্য হয়ে তাকে সমর্থন, (৩) রাজনৈতিক দলের কাজকর্মে অংশগ্রহণ এবং এর ফলে আইনসভার সদস্যদের ওপর দাবি আদায়ের সুযোগ লাভ,

(৪) অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রাজনৈতিক দলের প্রচার, (৫) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রাখা।

লিসটার মিলব্রাথ তাঁর *Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics?* (১৯৬৫) গ্রন্থে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কাজগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

(১) যোদ্ধাসুলভ কাজ (Gladiatorial Activities) : যোদ্ধাসুলভ কাজ বলতে কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মীদের ক্রিয়াকলাপকে বুঝিয়েছেন তিনি। যেমন—দলের পদাধিকারী হওয়া, দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, দলীয় সভায় যোগদান, দলীয় প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

(২) অন্তর্বর্তীকালীন কাজ (Transitional Activities) : এই কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দলীয় কর্মী বা সমর্থক হয়ে সভায় যোগদান, মনোযোগী শ্রোতা হয়ে সেগুলি শোনা, দলীয় তহবিলে অর্থ সাহায্য করা প্রভৃতি।

(৩) দর্শকমূলক কাজ (Spectator Activities) : দর্শকমূলক কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—নিজের দলের ভোট দেওয়ার জন্য অন্যদের প্রভাবিত করা, রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেওয়া ইত্যাদি।

সিডনি ভার্বা, নরমান নাই ও জো কিম তাঁদের *Participation and Political Equality : A Seven-Nation Comparison* (১৯৭৮) গ্রন্থে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এক ধরনের বিশেষীকরণের প্রবণতার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকারীকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(১) সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়, (২) ভোটার, (৩) স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী, (৪) সংকীর্ণমনা, (৫) প্রচারক ও (৬) সম্পূর্ণ সক্রিয়।

3.6 রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নির্ধারকসমূহ

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-ভেদে বিভিন্ন উপাদান বা নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একাধিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক কারণ বা নির্ধারক সমূহের বিশ্লেষণ করেছেন। যেগুলি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার বা তারতম্য ঘটানোর মূল চালিকাশক্তি। এগুলির মধ্যে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, জীবিকা, উপার্জন, লিঙ্গ, বাসস্থান, ধর্ম, গোষ্ঠীগত প্রভাব, গ্রাম ও শহরের প্রেক্ষাপট, সামাজিক পরিচিতি, রাজনৈতিক পরিবেশ, মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এর মধ্যে কোন উপাদান বা নির্ধারক কখন কি পরিমাণে কার্যকরী এবং প্রভাব বিস্তার করবে তা মূলত নির্ভর করে স্থান-কাল প্রেক্ষিতের উপর। যে সকল উপাদান বা নির্ধারপকসমূহ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(১) শিক্ষা : শিক্ষা ব্যক্তিকে তার বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলে। শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ব্যক্তির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের স্বাভাবিক ও আবশ্যিক যোগ আছে। অ্যালমন্ড ও ভার্বার মতে, শিক্ষা ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী করে তোলে, তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য পেতে সাহায্য করে, যার ফলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের আগ্রহ বেড়ে যায়। শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ ও দায়িত্ববান করে তোলে। তবে শিক্ষার হার বাড়লেই বা শিক্ষিত হলেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার বাড়বে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

(২) পেশা : পেশা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। সাধারণভাবে দেখা যায় নিম্নতর পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তির তুলনায় উচ্চতর পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সদিচ্ছা অধিকতর প্রবল হয় এবং তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে খুব ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হন। সেকারণে উচ্চতর পেশায় যুক্ত মানুষেরা রাজনীতিতে বেশি সক্রিয় থাকে। তবে ভারতবর্ষের নিরিখে বলা যায়, ভারতের বেশিরভাগ উচ্চ পেশায় মানুষজন অন্য রাজনৈতিক

ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও ভোটদান সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই আগ্রহী থাকে না। অন্যদিকে ভোটদানের ক্ষেত্রে নিম্নতর মানুষজন যেমন—কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর এঁদের মধ্যে ভোটদানের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

(৩) আয় : উচ্চ আয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, নিম্ন আয় সম্পন্ন মানুষের তুলনায়। কারণ উচ্চ আয় যুক্ত মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকার কারণে সে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অধিক সময় দিতে পারে। অন্য একজন নিম্ন আয় যুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও সে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য সময় দিতে পারেন না। তবে জাতীয় স্তরে আয় বেশি হলেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণে তার প্রভাব পড়বে কিংবা অংশগ্রহণের হার বাড়বে তার কোনো মানে নেই। তবে বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে নিম্ন আয় যুক্ত মানুষদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে নিম্ন আয় যুক্ত মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

(৪) বয়স : রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। তবে কোন বয়সের ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বেশি আগ্রহী সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। তবে সাধারণভাবে মধ্য বয়স ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে আগ্রহী দেখা যায়। কারণ অল্প বয়স্কদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কম থাকে এবং তাঁরা নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাগিদে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সময় দেওয়ার সুযোগ পান না। পাশাপাশি বয়স্করা শারীরিক দুর্বলতা বা অক্ষমতার কারণে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ তেকে বিরত থাকেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী বয়সের তারতম্যের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নিয়ম নাও খাটতে পারে।

(৫) লিঙ্গ : লিঙ্গভেদগত প্রেক্ষিত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নির্ধারকসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এই ধারণা উঠে এসেছে যে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নারী সর্বদাই পুরুষের তুলনায় কম অংশগ্রহণ করে। কারণ হিসেবে বলা হয়, নারীরা স্বভাবগতভাবে কোমল, রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ, রক্ষণশীল মানসিকতা সম্পন্ন এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের হার কম। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের লিঙ্গগত তারতম্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এই লিঙ্গগত তারতম্য বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। ভারতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বা বলা যায় রাজনীতিতে সর্বস্তরের নারীদের অংশগ্রহণে আগ্রহী করার জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৬) বাসস্থান : ব্যক্তির বাসস্থানও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বিশেষ প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের হার গ্রামাঞ্চলের লোকজনের তুলনায় শহরের লোকজনের মধ্যে বেশি। এক্ষেত্রে অবশ্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে। তবে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে গ্রামের লোকজনও খুব বেশি পিছিয়ে নেই। ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলিতে গ্রামের মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

(৭) ধর্ম : অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। যেমন পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা গেছে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী মানুষজন নির্বাচনে তখনই বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে, যখন তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে গভীরভাবে জড়িত কিছু বিষয় নির্বাচনে প্রধান ইস্যু হয়েছে। অনেকে মনে করেন, ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে কম অংশগ্রহণ করেন। তবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৮) জাতি ও গোষ্ঠী : বংশ বা জাতিগত বিচার বিবেচনার পাশাপাশি গোষ্ঠীও রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। গোষ্ঠী জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ব্যক্তি মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতা সাহায্য করে এবং ব্যক্তির মধ্যে এক বিশেষ মূল্যবোধ জাগ্রত করে। জাতিগত বিষয়ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের হার অধিক। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জাতি ও গোষ্ঠীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৯) রাজনৈতিক পরিমণ্ডল : রাজনৈতিক কাজকর্মে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা অনেকাংশে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বা বাতাবরণ গঠিত হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি, দলীয় ব্যবস্থার ধরন, নির্বাচনী ব্যবস্থার নিয়মকানুন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, সরকারের দক্ষতা ও কার্যকারিতা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতির মাধ্যমে। ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র যদি উন্মুক্ত হয় এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি স্বীকৃত ও প্রচলিত নিয়ম নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক কাজকর্মে জনসাধারমের অংশগ্রহণের হার অধিক হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। সরকারের সামগ্রিক সুদক্ষতা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের অদক্ষতা নাগরিকদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিস্পৃহ করে তোলে। উল্লেখ্য কোনো দেশের রাজনৈতিক এলাকা যদি অতিমাত্রায় বিস্তৃত হয় এবং রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের উপায় পদ্ধতি যদি অনুন্নত ও অপ্রতুল হয়, তাহলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার বা মাত্রা কম হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(১০) মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব : রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তির অংশগ্রহণে আগ্রহ কিংবা অনীহা সবক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক বিষয় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পূরণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এক্ষেত্রে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগিতা, সাফল্য, অর্থ, সম্মান, স্বীকৃতি, সহমর্মিতা, দায়বদ্ধতা এই সমস্ত মননগত কারণে ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

3.7 রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহার কারণ

কোনো একটি দেশের সকলেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না। অনেকেরই মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতির প্রতি যাদের অনীহা অর্থাৎ যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে তারা নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উদাসীনতার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। এই কারণগুলি হল—

(১) অনেক ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক কারণে ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা তৈরি হতে পারে। রাজনীতি ছাড়া ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে অন্য কোনো বিষয়ে অনেক বেশি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। অনেকে রাজনীতি ছাড়া পরিবার, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকলাপে নিজেকে বেশি ব্যস্ত রাখে।

(২) অনেকে আবার বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও স্বক্ষমতার ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিন্ত থাকেন যে, তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ না করলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

(৩) অনেকের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও চরিত্র দেখে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ হবে তার কোনো মানে নেই। অনেকে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং তিনি মনে করেন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন বা সংশোধন করা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়, সে কারণে রাজনীতি থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয়।

(৪) অনেকে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি কিংবা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির অসৎ প্রকৃতির কারণেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। তাঁদের বিশ্বাস প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সে কারণে তাঁরা রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করেন।

(৫) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে গেলে শ্রম ও সময় দুই ব্যয় করতে হয়। অনেকেই দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্য এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ইচ্ছা থাকলেও কোনোভাবেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।

(৬) বিপদের আশঙ্কায় অনেক ক্ষেত্রে অনেকে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে চান না। স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করলে বা রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের বিরাগভাজন হতে হয়। সে কারণে অনেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করেন।

সিম্যুর মার্টিন লিপসেট *Political Man* (১৯৬০) গ্রন্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রিয় থাকার পিছনে কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই কারণগুলি হল—

(১) অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি সম্পর্কে অনেকের মধ্যে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা থাকে। সে কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়াতে চান না।

(২) নিম্ন মর্যাদারসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিজের সম্পর্কে আস্থার অভাবের কারণেও তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

(৩) কিছু মানুষ জীবনধারণের জন্য এমন কিছু পেসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, যেমন—মৎস্যজীবী, খনিশ্রমিক, বন বিভাগের কর্মী, জাহাজের কর্মচারী ইত্যাদি; তারা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সময় ও সুযোগ কোনোটাই পান না। সে কারণে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

(৪) পারিবারিক সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক অবস্থা কিংবা পেশার প্রকৃতি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উদাসীন করে তোলে।

3.8 রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে পারে একমাত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপে নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রাক্কালে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে উদ্ভব হয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এবং এই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্ভব হয় সংসদ, নির্বাচনী ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, ভোটাধিকার, স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ার। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের পক্ষে আর প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করার সুযোগ রইল না। সে কারণে বিপুল আয়তন ও জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার জন্যই উদ্ভব হয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির।

যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সংসদ। বর্তমানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদ-এর সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি জনগণ সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সংসদের কার্যাবলী সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত থাকতে পারে এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে তারা সংসদের কার্যাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারে। অর্থাৎ একদিকে জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অন্যদিকে গণমাধ্যমের মাধ্যমে সংসদের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রতিনধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দলের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। গণতন্ত্রে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে। জনগণ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা অনন্য। রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের মাধ্যমে জনমত গঠন, জনগণের দাবিদাওয়াকে সমষ্টিবদ্ধ করা কিংবা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা অনন্য। স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিককালের সমাজব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিও সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন কিংবা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা, কোনো দাবিদাওয়া আদায়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বলাবাহুল্য এই সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণে যে বিশেষ সাহায্য করে থাকে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা ও সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা আবশ্যক। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং তার পছন্দ মতো প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনব্যবস্থা এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

3.9 গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্র ভালো আর কোন রাষ্ট্র খারাপ তা নির্ধারণ করে থাকি আমরা সেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পরিবেশ পরিস্থিতির মাপকাঠিতে। আর এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে একমাত্র সেই রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে জনগণের সার্বিক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জনগণ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল অধিকারী। তবে গণতন্ত্রের এই ধারণা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ অর্থে গণতন্ত্র বলতে শুধুমাত্র শাসনব্যবস্থা নয়, বৃহৎ গণতন্ত্র এক রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজ, গণতান্ত্রিক আদর্শ, গণতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রাধান্য পায়। সে কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি আবশ্যিক উপাদান হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণ।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ গণতন্ত্রে নাগরিকদের সম্পর্ক পছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং সরকারের সাড়া পাওয়ার ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে অর্থাৎ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গণতন্ত্রে সরকারের প্রতি প্রভাব ফেলা যায়। পাশাপাশি জননীতি প্রণয়নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায়। আবার জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করা বা তা অস্বীকার করা হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রতি শাসকের দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :

রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সের নগর রাষ্ট্রে। যেখানে মূলত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। গণতন্ত্রের এই ধরনে নাগরিকগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন। নগররাষ্ট্রের নাগরিকগণ একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্ধারিত স্থানে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন, সরকারি কর্মচারী নিয়োগ, এমনকি পররাষ্ট্র বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সুইটজারল্যান্ডের কয়েকটি সুইস ক্যানটনে এই ধরনের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :

রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি এবং বিপুল জনসংখ্যার চাপ যা নিয়ে আসে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে উদারনীতিবাদী তত্ত্বের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় প্রতিনিধিত্বমূলক উদারনীতিবাদী রাষ্ট্রে। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রের চরিত্র এই প্রকৃতির। এই গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের উপর সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করে থাকে। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের কাজকর্মের জন্য জনগণের কাছে বিশেষভাবে দায়িত্বশীল থাকে। বলাবাহুল্য এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন ব্যবস্থা জনসাধারণ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র।

বহু উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনোভাবেই কোনো উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। জনগণ যাতে সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে তার মতামত পোষণ করতে পারে সে কারণে গণমাধ্যম ব্যবস্থাকে স্বাধীন রাখা হয়। জনগণ গণমাধ্যমের মাধ্যমে সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে মতামত পোষণ করতে পারে এবং পরোক্ষভাবে সরকারি কাজকর্ম অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

পাশাপাশি ভারতের মতো অনেক প্রতিনিধিত্বমূলক উদারনৈতিক রাষ্ট্রে সরকারি কার্যাবলীতে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ভারতের প্রতিটি রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও পৌরসভার ব্যবস্থার কথা বলা যায়। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরের বহু জনগণ পঞ্চায়েত কিংবা পৌরসভার কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন। বলাবাহুল্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রে জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় এবং জনগণের সহযোগিতা লাভ করা যায়। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতার জন্য জনগণের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন তবে স্থান-কাল-ভেদে বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃতি ভিন্ন।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক বিশেষ ও আধুনিক রূপ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের উপর ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে উত্তরণের এক অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলতে জনগণের ব্যাপক অংশের গণতন্ত্র, মেহনতী মানুষের গণতন্ত্রকে বোঝায়। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং যেখানে সম্পদের সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মার্কসীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গণতন্ত্র ফলপ্রসূ হতে পারে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র চালু আছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জনসাধারণের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা বিশাল হলেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুণগত মান নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। মতাদর্শগত বা তাত্ত্বিক বিচারে সর্বসাধারণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যাপারে কোনো বিতর্ক না থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রবণতাটি প্রবল। সমালোচকদের মতে কমিউনিস্ট শাসনাধীন দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সক্রিয় হলেও তা মূলত কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালিত হয়।

3.10 সারাংশ

মূল্যায়ন : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণা উঠে এসেছে মূলত পশ্চিমি উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মূলত পশ্চিমি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাকে আলোচনা করা হয়। সেকারণে পশ্চিমি চিন্তার প্রেক্ষাপটে লালিত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাকে সরাসরি তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা অপ্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া কোনো স্থিতিশীল বিষয় নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের

পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাতেও বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ইন্টারনেট এবং তথ্য-প্রযুক্তির দৌলতে জন্মলাভ করেছে 'Cyber Democracy'-র ধারণা। এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ঘরানাও পরিবর্তন হয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও এই পরিবর্তিত ঘরানার দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিরাচরিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে উঠে এসেছে নানান ধরনের আন্দোলন, যার চরিত্র মূলত প্রতিবাদী। যেগুলিকে নতুন সামাজিক আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। যে আন্দোলনগুলো কখনও পরিবেশ রক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা, কখনও বা নারী অধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে সমাজের এক বড় অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ঘটছে। আবার ইন্টারনেটের দৌলতে বর্তমানে জনগণ তাঁর রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করছে ফেসবুক, টুইটার, হোয়্যাটসঅ্যাপ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হল এই ধরনের অংশগ্রহণকে কি আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হিসেবে গণ্য করতে পারি? এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো মত নেই। তবে একটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণা বিকাশলাভ করেছিল মূলত গণতন্ত্রের ধারণার বিকাশের প্রেক্ষিতে। সে কারণে গণতন্ত্রের পরিবর্তনশীল চরিত্রের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়েও নতুন ভাবে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

3.11 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

(ক) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কী? রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিভিন্ন প্রকারভেদ আলোচনা কর।

(খ) রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিভিন্ন নির্ধারক উপাদানগুলির সম্পর্কে আলোচনা কর।

(গ) রাজনৈতিক অনীহা (Political Apathy) বলতে কী বোঝ? এর কারণগুলি আলোচনা কর।

(ঘ) গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তাৎপর্য ও প্রকৃতি আলোচনা কর।

3.12 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

(a) Asraf, A. and Sharma, L.N. (1983). *Political Sociology: A new Grammar of Politics*. University Press Limited.

(b) Dobratz, B., Waldner, L., & Timothy, B. (2016). *Power, Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*. Routledge.

(c) Mukhopadhyay, A. K. (1977).*Political Sociology: An Introductory Analysis*. K P Bagchi & Company.

(d) Nie, N.H., & Verma, S. Political Participation. (1975) In F. I Greenstein and N. W. Polsby (Eds.), *Handbook of Political Science*. Addison-Wesley Publishing Company.

(e) মুখোপাধ্যায়, অম্বরীশ, 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পাদিত), রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, প্রকাশন একুশে, কলকাতা, ২০০৪।

(f) মিত্র, অভিষেক, 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র' রায়, সচ্চিদানন্দ (সম্পাদিত), রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ইতিবৃত্তান্তঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, এভেনেল প্রেস, কলকাতা, ২০১৭।

(g) চ্যাটার্জী, রীমা, 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ', চ্যাটার্জী, রীমা (সম্পাদিত), রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের সহজপাঠ, এভেনেল প্রেস, কলকাতা, ২০২১।

(h) মহাপাত্র, অনাদিকুমার, রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬।

(i) বেতেই, আঁদ্রে, গণতন্ত্র ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ (Democracy and Its Institution গ্রন্থের অনুবাদ), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮।

পাঠক্রম : ৩.১

Unit-4

Politics of Development/Underdevelopment and relevance of Developing Countries

বিষয়সূচি :

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 রাজনৈতিক উন্নয়ন

4.3 হান্টিংটন-ডোমিনগেজ

4.4 রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য ধারণা

4.5 রস্টো-অরগানস্কি

4.6 নির্ভরতার তত্ত্ব

4.7 ভারতীয় চিন্তক

4.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

4.9 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

4.1 উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণা এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই নিবন্ধে আমরা রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে আমরা কি বুঝি, রাজনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ধারণা, যেমন হান্টিংটন-ডোমিন গেজ, অ্যালমন্ড্র, কোলম্যান, রস্টো, অরগ্যানিক্স-র ভাবনা আলোচনা করেছি, তেমনই নির্ভরতার তত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে ভারতীয় চিন্তকদের ভাবনাও বলা হয়েছে। এই পাঠটি থেকে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা রাজনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে সংক্ষেপে হলেও একটি সম্পূর্ণ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবেন।

4.2 রাজনৈতিক উন্নয়ন

অক্সফোর্ড ইংলিশ অভিধানে উন্নয়ন বলতে বিকাশ বা বৃদ্ধির স্তরকে বোঝানো হয়েছে। সহজভাবে উন্নয়ন বলতে ইতিবাচক পরিবর্তন এবং বিকাশকেই বোঝানো হয়ে থাকে। "Growth" অর্থাৎ বৃদ্ধির বা প্রগতির একটি পর্যায় হলো উন্নয়ন। ধ্রুপদী চিন্তাবিদ অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডোর চিন্তাভাবনায় প্রথম উন্নয়নের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায়। ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথের "An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations" গ্রন্থ প্রকাশের পরই উন্নয়ন তত্ত্ব নিয়ে আগ্রহ দেখা যায়। সরকারি স্তরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ১৯৪৯ সালে উন্নয়ন বা 'Development' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর রাজনীতির আলোচনা ও পাঠাভ্যাস থেকেই উদ্ভূত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজবিজান গবেষণা পরিষদ (SSRC) এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগত দিক থেকে এই রাষ্ট্রগুলি ছিল অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল। পাশ্চাত্য উন্নত রাষ্ট্রগুলি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এই রাষ্ট্রগুলির জন্য আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের কথা চিন্তা ও ঘোষণা করেন, সেই বহিআর্ঙ্গিক কাঠামোর মধ্য থেকেই রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটির জন্ম। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে, ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রসংঘের লাতিন আমেরিকার জন্য ই.সি.এল.এ. (ECLA, Economic Commission for Latin America) গঠন। আর্থিক সহায়তা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন, রাজনৈতিক সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভূমি-সম্পর্কজাত রাজনৈতিক কাটামোর যে বাতাবরণ এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল, তার পরিবর্তন ঘটিয়ে উদারনৈতিক-গণতন্ত্রের রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করাই রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের অভিমুখ হিসাবে, (ক) রাজনৈতিক কাঠামোর কাজের পরিবর্তন; (খ) রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন; (গ) সরকারী ব্যবস্থাপনায় সমাজের প্রবেশ; ও (ঘ) রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রাগত পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ১৯৫০-১৯৬০ সালে মূলতঃ SSRC-র তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি বই প্রকাশ করেন। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নয়নমুখী রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণাভিত্তিক তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েকজন নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক এই বইগুলি রচনা করেন। গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড, লুসিয়ান পাই, ডব্লিউ.ডব্লিউ. রস্টো, সিডনি ভার্বা, জেমস্ কোলম্যান, মাইরন ওয়াইনার, যোসেফ লাপালোমবারা প্রভৃতিরা ছিলেন এই বইগুলির রচয়িতা। উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের প্রাসঙ্গিকতায় এঁরা, যোগাযোগ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, শিক্ষা, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার ভূমিকা অনুসন্ধান করেছেন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের একমাত্রিক, একরৈখিক কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। রাজনৈতিক উন্নয়নের মাত্রাগত ভিন্নতা রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা ও তার বিশেষ বিশেষ কাজের উপর এতটাই নির্ভরশীল, যে তার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে. রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সংযোগের অগ্রগতি, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর ও পুরসমাজের দ্বারা জনগণের দাবী-দাওয়া সমর্থন, ও সেই সমর্থনের ভিত্তিতে সরকারী ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়। কেননা, এর উপরেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সংযোগ, প্রশাসনিক সংগঠনের বিশেষীকরণ ও বহুমুখী কার্যকলাপের ব্যাপ্তি, গণমাধ্যমের স্বাতন্ত্র প্রভৃতি সুনিশ্চিত হয়।

রাজনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আলমন্ত এবং পাওয়েল রাজনৈতিক কাঠামোর বিশেষীকরণ ও তারতম্যের বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষতার মানের বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এস.পি. হান্টিংটন এবং জে.আই. ডমিনগেজ রাজনৈতিক উন্নয়নকে সামাজিক পরিবর্তনের সূচক হিসাবে নির্দিষ্ট করে, লক্ষ্য অভিমুখী কারণ যা বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে অভিলাসী, সেই পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন। হান্টিংটন আবার সংগঠনের স্থায়িত্ব ও মূল্যবোধ অর্জনের পদ্ধতিকে রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে চেয়েছেন। জে.এইচ. মিটেলম্যান সামাজিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের যুক্তিসংগত ব্যবহারকে রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে চেয়েছেন। যাই হোক না কেন, বিগত শতাব্দীর ৫০-৬০ বা ৭০-এর দশকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমাজেও রাজনৈতিক মাপকাঠিতে পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। যার ফলে আধুনিকীকরণকে রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপাদান হিসাবে অনেকেই মনে করতে চেয়েছেন; একই সঙ্গে সামাজিক সচলতা, অন্ধসংস্কার পরিহার, বৈধতা ও ন্যায়নীতির প্রাসঙ্গিকতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে; এবং এগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উন্নয়নমুখী রাষ্ট্রগুলির জাতি গঠনের প্রশ্নে। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপ যেমন শিল্পউন্নত সমাজে পরিণত হয়েছিল, নবজাগরণ এবং ধর্মসংস্কার

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, তেমনই কৃষিভিত্তিক এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনকেই রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একথা ঠিক, ১৯৫০-১৯৬০ সালের আগে রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে তেমন কিছু শোনা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি, যেগুলি ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় থেকেই ''তৃতীয় বিশ্ব'' নামে পরিচিত তাদের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থাকে উদারনৈতিক কাঠামোয় অভ্যস্থ করিয়ে নেওয়ার মার্কিন প্রয়াসেরই ঐকান্তিক ফসল রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণা। আমরা, তাই প্রথমে দেখে নেবো রাজনৈতিক উন্নয়নের উদারনৈতিক মুখটিকে, তারপরে দেখতে চাইবো এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনাকে এবং সবশেষে দেখতে চাইবো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য রূপরেখাকে।

4.3 হান্টিংটন-ডোমিনগেজ

১৯৭৫ সালে হান্টিংটন এবং ডোমিনগেজ রাজনৈতিক উন্নয়নকে চিহ্নিত করতে গিয়ে—(ক) ভৌগোলিক (Geographycal), (খ) উদ্ভবগত (Derivative), (গ) পরম কারনিক (Teleological), (ঘ) ক্রিয়াশীলতা (functional) এই চারটি উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন। ভৌগোলিক অর্থে কোন অঞ্চলকে আমরা উন্নয়নের নিরিখে বিচার করতে চাইছি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ যেখানে দারিদ্র, কৃষি, শিল্প অনুন্নত, রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতাকে মাপকাঠি করে উন্নত ও উন্নয়নমুখী বা অনুন্নত রাষ্ট্রিক কাঠামোকে নির্দিষ্ট করা হয়। উদ্ভবমূলক বলতে আধুনিকীকরণজাত উন্নয়নের মাত্রাকে চিহ্নিত করা হয়। যেখানে শিল্পায়ন, নগরায়ন, আর্থিক বৃদ্ধির হার, শিক্ষার হারে উচ্চমুখীনতা এবং গণমাধ্যমের ক্ষমতার মাত্রাগত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে উন্নয়নকে বুঝতে চাওয়া হয়। নৈতিকগুণগত মাত্রাকে একটি হয়ে ওঠার পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। উদ্দেশ্যর লক্ষ্যপূরণে এখানে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, বৈধতা, জাতীয় সংহতি, আমলাতান্ত্রিকতা প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হয়। ক্রিয়াশীলতার উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় শিল্পোন্নত-নাগরিক-পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে। বাস্তবে হান্টিংটন-ডোমিনগেজের তত্ত্বে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা হলো আধুনিকীকরণ। আর এই বিষয়টিকে উপযুক্ততা দিয়ে হান্টিংটন ১৯৮৭ সালে তাঁর উন্নয়ন ও আধুনিকতার তত্ত্বটি হাজির করেন।

১৯৮৭ সাল নাগাদ রাজনৈতিক উন্নয়নকে আধুনিকীকরণ ও সামাজিক পরিবর্তনের দ্যোতক রূপে চিহ্নিত করেছেন হান্টিংটন। আধুনিকীকরণের ধারণাটি একই সঙ্গে মিশ্র ও সামগ্রিক। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক উন্নয়নও হলো আধুনিকীকরণের পরিচায়ক। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিতে, কৃষিভিত্তিক সমাজে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর প্রক্রিয়া কিভাবে চালু হবে; এবং চালু হলে তার ভিত্তিতে আর্থিক সমতা, ক্ষমতার সামাজিক ব্যাপ্তি কতখানি উপযুক্ত হবে এই বিতর্কের মধ্য থেকেই হান্টিংটন তাঁর, "The Goals of Development" নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধে তাঁর মূল প্রশ্ন ছিল, উন্নয়নের নানাবিধ লক্ষ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করা, এখন প্রশ্ন হলো উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি কী? হান্টিংটনের মতে এই লক্ষ্যগুলি হল—সম্পদ বৃদ্ধি, বণ্টনে ন্যায্যতা, স্থায়িত্ব, গণতন্ত্র এবং জাতীয় স্বতন্ত্রতা। এই লক্ষ্যগুলির সম্পূর্ণতার প্রশ্নে হান্টিংটন তিনটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

প্রথমটি হলো—কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা। হান্টিংটন প্রাচীন সনাতনী রাজনীতি এবং আধুনিক রাজনীতির আপাত দ্বন্দ্ব এর অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাচীন, ধর্মীয়, পারিবারিক নৃকুলজাতিভিত্তিক কর্তৃত্ব-এর পরিবর্তে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিভিত্তিক, রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয়টি হলো রাজনৈতিক ক্রিয়ার বিশেষীকরণ, হান্টিংটন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভাজন ও বিশেষীকরণ ঘটিয়ে যে যে বিশিষ্ট কাঠামোর প্রেক্ষাপটে যেমন যেমন উন্নয়ন দরকার সেগুলির উদ্দেশ্য লক্ষ্যপূরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন; এবং তৃতীয়ত বা সর্বশেষে সমগ্র সমাজের, সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গেই হান্টিংটন খুব কৌশলে রাজনৈতিক আধুনিকতা, যা সনাতন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্দাপর্ণের আন্দোলনের একটি পর্যায় হিসাবে গণ্য হয়, তার সঙ্গে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের রাজনৈতিক প্রভাব যা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়, তার একটি মৌল পার্থক্য দেখিয়েছেন। হান্টিংটন একটি আন্দোলন হিসাবে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণকে নির্দিষ্ট করেছেন, আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামোর যৌক্তিকতায়। কিন্তু তাঁর মতে এই আন্দোলন সব সময়েই পুরাতন সমাজের অসংহতির পরিচায়ক এবং আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে অনুকূল কোনো পরিবেশ তৈরি করতে অসক্ষম। বাস্তব সমস্যা হলো, সামাজিক সচলতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা যত বৃদ্ধি পায়, সেইভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিকরণ ঘটে না। ফলে, দেখা দেয়, রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক সমস্যা হিসাবে হান্টিংটন তাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সঞ্জাত রাজনৈতিক বিলম্বন বা Political Lag-কেই চিহ্নিত করেছেন।

আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে যে সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক অসংহতি তা একই সঙ্গে সমাজে নতুন নতুন সামাজিক শক্তির ভারসাম্য ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ভিত্তিক রাজনৈতিক দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে। প্রয়োজন দেখা দেয় এমন এক রাজনৈতিক সংগঠনের যে এই অসংহতি; সামাজিক বিশৃঙ্খলার অবসান ইচ্ছায় প্রকৃত নেতৃ ও উপযুক্ত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু উপযুক্ত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন তার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাজিলে এক সময়ে উৎপাদন ও আর্থিক বৃদ্ধির হার খুবই বেড়েছিল। কিন্তু সামাজিক-আর্থিক অসমতার কারণে দেখা দিয়েছিল সামাজিক অসন্তোষ, ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। চীনে আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হলেও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারিত হয়নি। যা চাওয়া হচ্ছে এবং যা পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে চাওয়া-পাওয়ার এক বিরাট ফাঁক তৈরি হচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক সমাজে শৃঙ্খলা স্থিতবস্থার অভাব দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রশ্নে কেউ কেউ ''আমলাতান্ত্রিক-'কর্তৃত্ববাদের' উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। হান্টিংটন অবশ্য এই যুক্তিতে আস্থা রাখেন নি। কারণ তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কখনই আর্থিক বৃদ্ধি হার উঁচু মাত্রায় হয় না। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে আর্থিক বৃদ্ধির হার খুব উঁচু মাত্রায়ও হতে পারে আবার মাঝারি বা খুবই নীচু মাত্রায় ঘটতে পারে। আসলে উন্নয়নের প্রশ্নে এই যে বৃদ্ধির গতি ও হার তা বেশীরভাগ সময়েই আর্থিক উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও তার স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। এই আন্ত সম্পর্কটিকে না বুঝতে পারলে রাজনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিকেও বোঝা যাবে না। হান্টিংটন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রটিকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিকরণ রূপে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছে। কারণ তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিকরণের মধ্যেই রাজনৈতিক উন্নয়নের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। আর এর বিপরীতে অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের অভাব সমাজে হিংসা-বিশৃঙ্খলা তৈরি করে যার পরিণতিতে অনিবার্য হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অবক্ষয়।

রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে হান্টিংটনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল সামাজিক-আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে? না কি রাজনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক-আর্থিক পরিবর্তনের পথ সুগম করে? কার্যতঃ রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য দুটি পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে কাজ করে। প্রশ্ন কে-কাকে অনুসরণ করবে? বা আদৌ এদের মধ্যে কোনো সমন্বয় সম্ভব কি? তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নমুখী রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের চর্চার ফলিত অভিজ্ঞতা থেকেই হান্টিংটন দেখিয়েছেন এই রাষ্ট্রগুলিতে (ক) জন সমর্থনবাদী বা পপুলিস্ট দুষ্টচক্র; এবং (খ) প্রযুক্তিতান্ত্রিক দুষ্টচক্র'র অতি তৎপরতায় উন্নয়নের হার থমকে যায়। একই সঙ্গে বিস্তৃত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, উৎপাদনের মন্দগতি, শ্রেণীসংঘাতের তীব্রতা, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অতিরেক; এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার গ্রহণ, চূড়ান্ত গণ অসন্তোষ অস্থিতাবস্থা বিরোধী অংশগ্রহণের বিস্ফোরণ, রাজনৈতিক উন্নয়নের উপযুক্ততায় বাধা সৃষ্টি করেছে। হান্টিংটন এক্ষেত্রে সংস্কৃতি তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান উন্নয়নের ক্ষেত্রটির উপর সবিশেষে গুরুত্ব দিয়েছেন। হান্টিংটনের ধারণায় উন্নয়নের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যগুলির মধ্যে মানিয়ে নেওয়া, সমঝোতা করার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারলে হয়তো উন্নয়নমুখী রাষ্ট্রগুলি

রাজনৈতিক উন্নয়নের একটা সঠিক দিশা খুঁজে পাবে এবং এক্ষেত্রে সংস্কৃতিই তাঁর কাছে নির্ধারণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

4.4 রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য ধারণা

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে (১৯৬০) অ্যালমন্ড এবং কোলম্যান সম্পাদিত "The Politics of Developing Areas" গ্রন্থে অ্যালমন্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তার পরস্পর নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণাত্মক সীমারেখা ও কাজের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ভাবনা থেকেই অ্যালমন্ড এবং কোলম্যান রাজনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক কার্যাবলী এবং উন্নয়ন সম্পৃক্ত সমস্যাবলীর অন্তসম্পর্ককে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে এই বিষয়গুলির আন্তসম্পর্কই রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণ করে। অ্যালমন্ডের মতে উন্নয়নের পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থা চার ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর প্রথমটি হলো রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা, দ্বিতীয়টি হলো জাতি গঠনের সমস্যা, তৃতীয়টি হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সমস্যা এবং চতুর্থটি হলো সম্পদ বণ্টনের ও পুনর্বন্টনের সমস্যা। অ্যালন্ডের ব্যাখ্যানুযায়ী রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা রাজনৈতিক কাঠামোর পার্থক্যজনিত অনন্যতা, কাজের বিশিষ্টতা, সংস্কৃতির লোকায়তকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিবেশের অন্তর্গত সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থ্য করে তোলে।

লুসিয়ান পাই অ্যালমন্ডকে অনুসরণ করে বিগত শতাব্দীর সাতের দশকে (১৯৭২) "Aspects of Political Development" গ্রন্থে বললেন, রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাজনৈতিক প্রাক্ শর্ত, অর্থাৎ রাজনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। রাজনৈতিক উন্নয়নকে তিনি শিল্প সমাজের রাজনীতি বলে উল্লেখ করে—(ক) জাতি গঠনের সমস্যা; (খ) প্রশাসনিক ও আইনগত উন্নয়নের সমস্যা; (গ) জন সচলতা; (ঘ) গণতন্ত্র নির্মাণ; (ঙ) স্থায়িত্ব ও নিয়মানুগ পরিবর্তন; (চ) ক্ষমতার বিচলনীয়তা ও (ছ) সামাজিক পরিবর্তন পদ্ধতির মাত্রাগত ভিন্নতার মধ্যে দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। লুসিয়ান পাই সমতা, সামর্থ্য এবং বিশেষীকরণ ভিত্তিক পৃথকীকরণকে মাধ্যমকে রাজনৈতিক উন্নয়নের তিনটি বিশিষ্টতা রূপে চিহ্নিত করেছেন। জাতীয় নাগরিকতা যা সর্বজনীন আইনগত কর্তৃত্বের দ্বারা নির্দিষ্ট, রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমন করবে এবং প্রত্যেকটি বিভাগের স্বতন্ত্র বিশেষীকৃত ভূমিকা পালন ও প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্টতা চিহ্নিত করার মাধ্যমেই রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, এই ছিল পাই-এর বিশ্বাস।

ডেভিড অ্যাপ্টার তাঁর "The Politics of Modernization" গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনকে এক নূতন ভূমিকার সূচক তৎজনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই রাজনৈতিক উন্নয়নকে বিচার করতে চেয়েছেন। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, আর্থিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাবের উপর সামাজিক পরিবর্তন নির্ভরশীল। অ্যাস্টারের মতে শিল্প অর্থনীতির উপযোগী ভূমিকা বিস্তারের মধ্যেই রাজনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ গড়ে ওঠে। এই পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামরিক ও গণপ্রশাসন, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল, পেশাদার শ্রেণী, প্রযুক্তিবিদরা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। অ্যাপটারের মতে, শিল্পায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাবার পর বলপ্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আর থাকে না, তখন উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুত ও বিনিয়ম, নিয়মানুগ বিরোধ নিষ্পত্তি রাজনৈতিক সমাবেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা হয়।

4.5 রস্টো-অরগানস্কি

আধুনিকীকরণ এবং রাজনৈতিক উন্নয়নকে একটি একরৈখিক মাত্রায় যারা বিবেচনা করেন, তাঁরা সনাতন কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে উত্তরণকেই উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করেছেন। আপাতবৈরীতা থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখ করতে হয়। রস্টো এবং অরগানস্কির অবদান। রাস্টো (W.W. Rostow) ১৯৬০ সালে একটি পুঁজিবাদী মডেলকে উন্নয়নের মাপকাঠি বিবেচনা করে যে কোন সমাজেই এই উন্নয়নের বিষয়টিকে একটি সর্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছেন। জেনে রাখা ভালো, রস্টোর মডেলটি সম্পূর্ণতই কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিরোধী এবং কার্ল মার্ক্সের আধুনিক ইতিহাস দর্শনের বিপ্রতীক একটি ধারণা, রস্টো আর্থিক বৃদ্ধিকে খুব স্বাভাবিক একটি পদ্ধতি হিসাবে দেখতে চেয়েছেন এবং বলেছেন উপযুক্ত সম্ভাবনা থাকলে যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই উন্নয়ন সম্ভব। এই সূত্রে সনাতন বা পুরাতন ব্যবস্থা বলতে রস্টো সেই ব্যবস্থা বা সমাজকেই বুঝিয়েছেন, যারা কৃৎকৌশলগত উন্নয়নকে পরিহার করতে চাইছে। যতক্ষণ না রূপান্তরের একটি পর্ব সমাধা হচ্ছে, ততক্ষণ আর্থিক বৃদ্ধির বা উন্নয়ন ঘটেছে, এমনটি বলা যাবে না। রস্টো পুঁজিবাদী-শিল্পভিত্তিক উন্নয়নকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন, এই ভাগগুলি আবার বিমানে সফর যাত্রার নাম ও ঘটনার অনুসঙ্গী।

(ঙ) উচ্চ ভোগের অর্থনীতি (High mass consumption)

⇧

(ঘ) পরিণত অর্থনীতির পথে যাত্রা (Drive to maturity)

⇧

(গ) প্রকৃত উল্লম্বন (Take-off)

⇧

(খ) উল্লম্বনের পূর্বশর্তগুলি (Pre condition for take-off)

⇧

(ক) সনাতন অনুন্নত অর্থনীতি ও সমাজ (Tradition not society)

⇧

আধুনিকতার সমানে তাঁর উন্নয়নের ধারণাকে পরিচিত করিয়ে ৬০-এর দশকের শিল্প-উন্নত সমাজ অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ ধাপে স্থান দিয়ে রস্টো ভারত, চীন, তুর্কী, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনাকে উল্লম্বন বা take off-এর উচ্চতায় স্থান দিয়েছেন।

রস্টোর বিপ্রতীকে অরগানস্কি ১৯৬৫ সালে উন্নয়নের এক নতুন ধারণার অবতারণা করলেন। অরগনস্কির মতে, সরকার কতটা দক্ষতার সঙ্গে দেশের মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদকে জাতীয় লক্ষ্য পরিপূরণে ব্যবহার করছে সেই মাত্রার উপরে উন্নয়ন নির্ভরশীল, রাজনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপে অরপানস্কি চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন।

(ঘ) আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ (Abundance)

⇧

(গ) জাতীয় কল্যাণ (Industrialisation)

⇧

(খ) শিল্পায়ন (Primitive Unification)

⇧

(ক) প্রারম্ভিক ঐক্যমত

একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসন, শিল্পায়ন ও জাতীয় কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা ও শক্তির পুঞ্জীকরণ ঘটিয়ে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণআকে বিপন্ন করে যেভাবে আঞ্চলিক বা মহাদেশীয় রাষ্ট্র জোটের পথে অগ্রসর হয়, অরগানস্কি মতে সেটাই রাজনৈতিক উন্নয়ন, রস্টোর ভাবনার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের (Political Economy) এক অনন্য রূপকল্পার আভাস পাওয়া যায়, অরগানস্কির ভাবনা।

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে রাজনৈতিক উন্নয়ন চারটি মাত্রার উপর নির্ভরশীল। এগুলি হলো যথাক্রমে—

(ক) রাজনৈতিক স্বচ্ছতার মাত্রা বৃদ্ধির;

(খ) বর্ধিত চাহিদার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়ে ওঠা;

(গ) চাহিদার প্রক্রিয়ায় এবং অগ্রগতিতে সমর্থ্য হওয়া;

(ঘ) রাজনৈতিক উদ্যোগপতির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার সামর্থ্য অর্জন করা।

ইলচম্যান এবং উপহফ্ নামে দুই তাত্ত্বিক রাজনৈতিক ভিত্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ, নির্বাচন, উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সম্পদ ও সহায়ক রূপে বিচার করে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতা বিচার করতে চেয়েছেন। কেন না প্রশাসনিক স্থায়িত্ব না আনতে পারলে উন্নয়নমুখী নীতি রূপায়ণ সম্ভব হবে না।

4.6 নির্ভরতার তত্ত্ব

রাজনৈতিক উন্নয়নের উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরেও বেশ কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন, আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক, সামির আমিন, ডস স্যানটস কারভোসো এবং ফ্যালেটোরের অবদান উল্লেখযোগ্য। ওয়ালারস্টাইন তাঁর নির্ভরতার তত্ত্বে বলেছেন উন্নত দেশগুলির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির শর্ত হলো পরনির্ভর দেশগুলির অনুন্নয়ন। কেন্দ্র ও প্রান্ত পরিধির ধারণার অবতারণা করে—

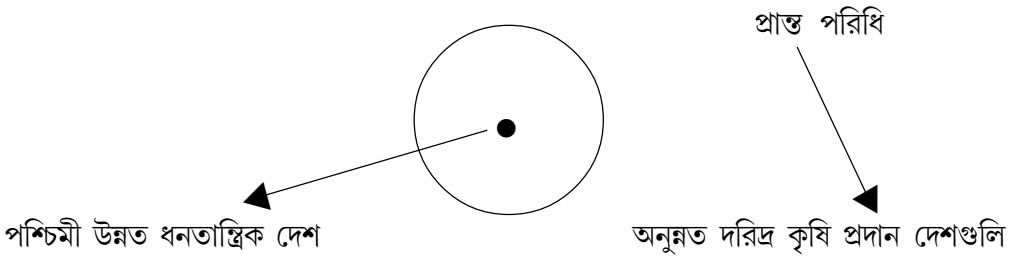

ওয়েলার-স্টাইন বলেছেন যে বিশ্ব ব্যবস্থার মূলকেন্দ্রে অবস্থান করছে পশ্চিমী উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, আর বৃত্তের দূরবর্তী পরিধিতে অবস্থান করছে অনুন্নত দরিদ্র কৃষি প্রধান দেশগুলি। বিগত চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে ধনতন্ত্রের প্রসারে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তারে কৃষিপ্রধান দেশগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা হয়েছে ও পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের উন্নয়নের জয়গান গাওয়া হয়েছে। বৃত্তের প্রান্ত পরিধিস্থিত দেশগুলিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর আদল ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ করে রাজনৈতিক বশ্যতার মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, পাশ্চাত্যের উন্নয়ন সম্পূর্ণতঃই অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশগুলির কাঁচামাল সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। ইউরোপীয় কেন্দ্রবিন্দু থেকে আগত ধনতন্ত্র এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে কীভাবে আত্মস্থ্য করে উন্নত হয়ে উঠলো নির্ভরতার তত্ত্বে তাই বর্ণিত হয়েছে। আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক তাঁর অনুন্নয়নের তত্ত্ব (Theory of underdevelopment)-এ বলেছেন উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন একে অপরের কারণ এবং ফল। ফ্রাঙ্ক তাঁর কেন্দ্র-প্রান্ত পরিধি তত্ত্বে (centre-Periphery theory) তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে প্রান্তপরিধি হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছেন বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত উন্নত পুঁজিবাদী সমাজ মূলত এই প্রান্ত পরিধিতে অবস্থিত সমাজের উপর

নির্ভর করে তাদের উন্নয়নের বিজয় রথ ছুটিয়ে চলেছে। ধনতন্ত্রের উদ্ভব পর্ব থেকে বিশ্ব অর্থনীতি যেভাবে সংগঠিত ও ক্রিয়াশীল থেকেছে তার অনিবার্য পরিণতিতে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশসমূহ এবং উপনিবেশগুলি ক্রমাগত অনুন্নয়নের পথে হেঁটে চলেছে, আর তাদের সম্পদ ঔপনিবেশিক দেশগুলির উন্নয়নকে শুধু সম্ভব নয়, ত্বরান্বিতও করেছে, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ফ্রাঙ্ক কেন্দ্র বা metropole বলেছেন, আর কাঁচমালের জোগাড় দেশগুলিকে বলেছেন উপগ্রহ বা satellite।

কেন্দ্রের সম্পদ ও বৈভবের উৎস হলো উপগ্রহ, উপগ্রহগুলির থেকে উদ্বৃত্তের বহির্গমণই তাদের দারিদ্র্যের কারণ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজস্ব শিল্পায়ন পদ্ধতি, এবং যা সংগঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতিতে তাই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ননের একমাত্র পদ্ধতি, ফ্রাঙ্ক আরও বলেছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছন্ন করেই সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ঘটিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

মিশর দেশের অর্থনীতিবীদ সামীর আমিন পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে উন্নত-অনুন্নত রাষ্ট্রের সম্পর্ক বোঝার জন্য বাণিজ্য সম্পর্কের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন। ওয়ালারস্টাইন-এর মত বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমিনও প্রান্ত পরিধিতে সর্বহারা শ্রেণীর অবস্থানের কথা বলে বুর্জোয়ারা কিভাবে কেন্দ্রে অবস্থান করে উন্নয়নের নামে শোষণ করে চলেছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমিন দৃষ্টি দিয়েছেন প্রান্ত অর্থনীতিগুলোর উৎপাদন সম্পর্কের উপর। স্বয়ংচালিত কেন্দ্রীয় অর্থনীতির আধিপত্যের কারণেই প্রান্ত পরিধিতে অবস্থিত দেশগুলি শিল্পোন্নত হয়ে উঠতে পারছে না। এই অসম আর্থিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সমাজতন্ত্র ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলেই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন সম্ভব।

নির্ভরতার তত্ত্বের আর এক তাত্ত্বিক ব্রাজিলীয় অর্থনীতিবিদ ডস স্যান্টোস নির্ভরতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, নির্ভরতা হলো এমন ব্যবস্থা যেখানে কিছু দেশের অর্থনীতি, তার উপর আধিপত্যকারীদের ও অঞ্চলের অর্থনীতির বিকাশ ও বিস্তার-এর কাছে পরাধীন থাকে। বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ অনুন্নত দেশগুলির শিল্পোন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক আর্থিক নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমেই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে ডস স্যান্টোস—(ক) ঔপনিবেশিক নির্ভরতা; (খ) আর্থিক-শিল্প পুঁজির নির্ভরতা; (গ) নব্য নির্ভরতার তত্ত্ব হাজির করেছেন।

আধুনিকীকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্ব বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে রয়েছে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের পথ। কারডেসো এবং ফ্যালেটো দুই ব্রাজিলীয় তাত্ত্বিক মনে করেন বিশ্ববাজারের অর্থনীতির উপরেই নির্ভরতাই তৃতীয় বিশ্বের উন্নতির প্রতিবন্ধক। তাদের মতে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একটা পর্যায় অবধি শিল্প-উন্নতি চায় এবং সেটা সম্পূর্ণতই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে বাজার ধরে রাখার জন্য। সুতরাং বোঝাই যায়, সে উন্নয়ন স্ব-নির্ভর নয়। নিজস্ব পুঁজি ও প্রযুক্তি স্বাধীন কোন ভারী শিল্প না থাকায় এই উন্নয়ন স্বাভাবিক ও সুস্থ-সুষম হয় না; বরং সম্পদের বিপুল অসম বণ্টন ঘটিয়ে সমাজের এক বড় অংশের মানুষকে আর্থিক উন্নয়নের প্রান্ত সীমায় নিয়ে যায়। দেশের সমাজের এই অনুন্নয়ন অবস্থার জন্য দায়ী বিদেশি পুঁজি ও রাজনৈতিক শক্তির সমঝোতা। আমলাতান্ত্রিক-প্রযুক্তিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই উন্নয়নের এমনতর অবনতির জন্য দায়ী করা হয়।

এই তত্ত্বের মধ্যে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের ছায়া পাওয়া যায়। উদারনীতির আধুনিকতাবাদীরা ধনতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নকে উন্নয়ন বলেছেন। অপরপক্ষে নির্ভরতার তাত্ত্বিকেরা সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন চেয়েছেন। নির্ভরতা তত্ত্বকে অনেকে মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ বলে সমালোচনা করেছেন। নির্ভরতা তত্ত্ব অনাসক্ত বিশ্লেষণের পথ পরিত্যাগ করেছে, এমনটি বলে আলমন্ড মূল্য নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক আলোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আলমন্ড-এর এই মন্তব্য আবার অন্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট তৈরি করে, কারণ সমাজবিজ্ঞানে সত্যি কি মূল্যমান নিরপেক্ষ আলোচনা করা যায়! অনেকেই আবার এই সূত্রেই রাজনৈতিক উন্নয়নের ''তিন বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি''-র (three worlds approach) উল্লেখ করেছেন। তিন বিশ্ব হলো—(ক) পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্ব; (খ) কমিউনিস্ট দ্বিতীয় বিশ্ব; (গ) উন্নয়নমুখী তৃতীয় বিশ্ব। আর্থিক, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও কৌশলগত মাত্রায় বিন্যস্ত উন্নয়নের এই দৃষ্টিভঙ্গি।

4.7 ভারতীয় চিন্তক

রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বগুলি ষাটের দশকে, সত্তর থেকে আশীর এর দশকে নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক উন্নয়নের আলোচড্ডায় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির বৈচিত্র্য ও বহুত্ব জটিলতা তৈরি করেছে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকেই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক সংকট, মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিস্তার, রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবনমন, গণতান্ত্রিক পরিবেশের অবনতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মৌলবাদের বিস্তার জনপ্রিয় রাজনীতির বাহুল্য ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের কাছে উন্নয়নের প্রশ্নটিকে এক অন্যতম মাত্রা দিয়েছে। ভারতে প্রথম রজনী কোঠারি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর "politics in India" গ্রন্থে পাশ্চাত্য আধুনিকীকরণের ভাবনার মৌল উপাদানগুলি মেনে নিয়ে একটি অনন্য ভারতীয় রূপকল্প কথা বিবেচনা করেছিলেন। ভারতের বহুধা বিভক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচিতি (identity)-র মধ্য থেকে একটি রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে, এমনটি ছিল তার ভাবনা। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রতিনিধিত্বের প্রসারণ-এর সাথে সাথেই সমাজের প্রান্তিক মানুষের আপন আপন স্বাতন্ত্র অক্ষুন্ন রেখেই মূল জাতীয় স্রোতে কিভাবে মিশে যেতে পারছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি ও নেতৃত্বের অবক্ষয়, দুর্বৃত্তায়ন, প্রান্তিক মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ, উপর থেকে চাপ চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবেশে অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করেছিল। পাশ্চাত্য উন্নয়ন রূপকল্পের অন্ধ অনুকরণ এবং দলীয় রাজনীতির সামন্ততান্ত্রিক ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাস রজনী কোঠারিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। এই সময় থেকেই, তিনি গণ রাজনীতি, নিম্নস্তরের গণ অংশগ্রহণ, অদলীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপরে আস্থা রাখতে শুরু করেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক সমাজের (Political Society) ধারণাকে আশ্রয় করে উন্নয়নের এক নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরী করলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরম বহিঃপ্রকাশের বিপ্রতীপে নাগরিক সমাজের অবস্থান, এই ধ্রুপদী ধারণার উপর ভর করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নাগরিক সমাজের সংঘবদ্ধতার কাঠামোয় সমতা, স্বতন্ত্র, চুক্তি, আলোচনা, প্রবেশ-প্রস্থানের স্বাধীনতা, প্রভৃতির মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অধিকার ও কর্তব্যের নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকালেই নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠে। কিন্তু সমস্ত আর্থিক কাঠামো, নাগরিক এলিটদের কপটতা (hypocrisy) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ মিথষ্ক্রিয়ায় ন্যূনতম অংশগ্রহণ ভারতের নাগরিক সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে দেয়নি। নাগরিক সমাজের বাইরে যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী তার সঙ্গেও রাষ্ট্রের কোন আদান-প্রদান ঘটেনি। রাজনৈতিক সমাজ গঠনের মূল লক্ষ্য এই আদান-প্রদানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা। এই ক্ষেত্র বিস্তৃত করা। এই ক্ষেত্রের প্রকৃত বিস্তার ঘটলোই রাজনৈতিক উন্নয়নের পথ চলা শুরু হবে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক সমাজে চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—(ক) রাজনৈতিক সমাবেশ যা আইনকে পাস কাটিয়ে সংগঠিত হয় এবং যা নাগরিক সমাজের বাইরের জনগোষ্ঠীকে তাদের দাবি স্থাপিত করতে উৎসাহিত করে। (খ) আইনগতভাবে স্বীকৃত না হলেও এরা সরকারের কাছে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা অধিকার মনে করেই দাবি করে। (গ) এই অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় যৌথ অধিকার হিসেবে, যাকে সরকার অস্বীকারও করতে পারে না। (ঘ) আইনানুগ সম্পর্ক নাগরিক সমাজ ও সরকারের মধ্যে স্থাপিত হয়, এই জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। ফলে এই জনগোষ্ঠী সরকার বা নাগরিক সমাজের সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের উপর কতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারছে তার উপর এদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়টি বিবেচিত হয়। ভারতের উত্তর ঔপনিবেশিক কালপর্বে রাজনৈতিক সমাজের অবস্থান, তার সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক এবং নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনার সূত্র ধরেই নৈতিক উন্নয়নকে বুঝতে হবে।

আবার, আশিস নন্দী তৃতীয় বিশ্বের লোকসমাজের যৌথ অধিকার, গণতান্ত্রিকতার প্রেক্ষাপটে জাতি রাষ্ট্রের উপযুক্ত গঠনে লোকসমাজের স্বাতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন। অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মতে ভারত এবং ভারতের মতো তৃতীয়

বিশ্বের দেশগুলোতে উন্নয়নের জন্য সঠিক শিল্পনীতি বা মুদ্রানীতি যেমন দরকার, তেমনিই সমান জরুরী ট্রাস্ট বা সমাজে পারস্পরিক আস্থা। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে আদিম উপজাতি সমাজের দারিদ্র সত্ত্বেও পারস্পরিক আস্থার মাত্রা বেশি। বাইরের লোকদের দ্বারা তারা শোষিত হয়েছে, কিন্তু নিজেদের সলিডারিতে কোন অভাব দেখা দেয় নি। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার গবেষণায় প্রমাণিত, যে সমস্ত গোষ্ঠী বা জাতির লোকজন একে অন্যকে বিশ্বাস করতে পারে তাদের উন্নতির গতিও অনেক দ্রুত হয়। কৌশিক বসু মনে করেন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব ঠিকই, তবে এ জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। এছাড়াও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের ভাবনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চাহিদার যে ফারাক তাকে দূর করতে হবে। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন ''হিস্ট্রি ফ্রম বিলো''-র মত ''ইকোনমিক্স ফ্রম বিলো''-র চিন্তাভাবনা করাটা খুবই জরুরী।

এটা খুবই স্পষ্ট যে উন্নয়নের ধারণার জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য রাজনৈতকি অঙ্গন থেকেই, কিন্তু তার লক্ষ্য উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ বা তৃতীয় বিশ্বের রাজ্যগুলি। আলমন্ড পাওয়েল, দ্রাঁ দ্রোজ, অমর্ত্য সেন নানাবিধ প্রবন্ধ, বক্তৃতা, সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৃতীয় বিশ্ব উন্নয়ন বিষয়ে কতকগুলি নীতি রূপায়নের কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলি হল—(1) দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ; (2) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন; (3) লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি করা ও নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা; (4) শিশু মৃত্যু রোধ করা; (5) মায়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতি করা; (6) এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারণ রোগ প্রতিরোধ করা; (7) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা; (8) উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বজোড়া অংশীদারি দায় তৈরি করা।

এই নীতি পূরণের লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জন অংশগ্রহণও একান্ত জরুরী।

4.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

(1) রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝ? রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে হান্টিংটন ও ডোমিনগেজের তত্ত্ব আলোচনা কর।

(2) নির্ভরতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

(3) রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে রস্টো ও অরগানস্কির মতামত আলোচনা কর।

(4) রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে ভারতীয় চিন্তকদের ধারণাগুলি পর্যালোচনা কর।

4.9 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

(a) Almond, G.A., & and Powell, G.B. Jr. (1966).*Comparative Politics: A developmental approach*. Little, Brown and Company.

(b) Ashraf, A., &Sharma, L.N. (1983). *Political Sociology: A New Grammar of Politics*. Universities Press.

(c) Chakraborty, S. (Ed.). (2005). *Political Sociology*. Macmillan India.

(d) Green, D.&Luehrmann, L. (2007).*Comparative Politics of the Third World: Linking Concepts and Cases*. Lynne Rienner.

(e) Pye, L. (1966).*Aspects of Political Development: An Analytic Study*. Little, Brown.

(f) Rush, N., & Althoff, P. (1971). *An Introduction Political Sociology*. Bobbs-Meril.

(g) Weiner, M., Huntington, Samuel P., & Almond, G.A. (1987).*Understanding Political Development: An Analytic Study.*Little, Brown.

C.C : 3.1

Unit-5

Decolonization, Nation building and the Post-Colonial State

Content :

5.1 Objectives

5.2 Introduction

5.3 Decolonization

5.4 Nation-building

5.5 Postcolonial State

5.6 Conclusion

5.7 Self Assessment Questions

5.8 Suggested Readings

5.1 Objectives

- To learn about the process of decolonization
- To learn about the concept of nation-building
- To know about the consequences of nation-building in post colonial states.

5.2 Introduction

Decolonization refers to the process through which the political control of one country over another for economic gains came to an end. Since the fifteenth century, the European countries buoyed by historical developments, economic changes and scientific breakthroughs entered a trajectory that ushered in the modern period. The modern period is characterized by the nation-state and the capitalist economy. The transition from the medieval to the modern encouraged the age of discovery and conquest. The voyages of discovery were motivated both by curiosity but funded for their economic potential. The political control of countries in Asia, Africa, Latin America and the Pacific by European powers for economic exploitation is called colonialism. The modern nation-state which developed in Europe proved to be superior to the existing pre modern political arrangements of the rest of the world. The ideological, organizational and technological dominance of Western European states was such that for the next few centuries all the countries in the world either came under their direct or indirect control. Decolonization describes the phenomenon by which the former colonies achieved independence and self-government.

Decolonization lead to the creation of a large number of new states. These newly independent states are called postcolonial states or developing countries and even the third world. Postcolonial states were shaped by the process of decolonization. The colonial powers were paramount in the determination of the contours of the states. Unlike the West, where state development was driven by internal dynamics, for most of the postcolonial states, the state development took place due to external pressures and once the state came into being it had to build the nation.

The orientation of postcolonial states has been to be developed like European states. A key factor for a strong state is support for the state which is dependent on levels of national unity. Nation-building is the process of forging a sense of a common national identity, whether defined in an ethnic, cultural or political sense to overcome differences. Therefore, one of the ways to study the state in postcolonial society is to focus on the circumstances of its creation and its specific peculiarities.

5.3 Decolonization

Decolonization was a momentous event of global political impact. Usually we refer to decolonization as a process rather than an event as it was spread over a period of time. Decolonization is often understood as the legal transfer of colonial territories to indigenous sovereign nation-states (Duara 2004). But decolonization was also the hope for a complete change in social order as the oppressed people became free and in control of their own destinies (Betts 2012). Even by itself the transfer of power was ‘a moment of profound realignment’, as colonialism was not merely legal control, it was ideological, cultural and operated through a complex knowledge system that subordinated colonized people (Smith and Jeppeson 2017). Thus, decolonization goes beyond the political to include all aspects of the colonial experience. It involved regaining control of the economy from the capitalist system which was dominated by the ex-colonial powers. The colonial powers cultural system that suppressed local cultures and discounted indigenous culture necessitated the decolonization of the mind.

There are two chronologies of decolonization; one refers only to the independence of countries in Asia, Africa and the Pacific after the Second World War. The other also includes the decolonization of the countries of South and Central America (except for Cuba and Puerto Rico). Duara writes that Japan’s defeat of Czarist Russia’s army in the war of 1905, the first time a European/Imperial power was defeated by a non European one, can be said to symbolize the beginnings of decolonization. The culmination of the decolonization movement for Duara was the Bandung Conference in 1955, where the new nations of Asia and Africa met to express solidarity against imperialism and racism and to promote economic and cultural cooperation among them (2004). It is generally believed that the World Wars made conditions for colonialism unfavorable as the colonial powers lost their preeminent position in the world. The new great powers, the United States and the Soviet Union both opposed colonial empires. The beginning of the Cold War brought the focus of the colonial powers back to Europe. The establishment of the NATO heralded the era of European Cooperation not colonial rivalry (Betts 2012).

Even though decolonization meant self-determination for the majority of the world, imperialism continued in new forms. Informal imperialism was the indirect control of the new sovereign states through military and financial dependence without the need for direct political control (Stearns 2008). The economic exploitation of the colonial period continued under conditions of underdevelopment. Underdevelopment referred to the high levels of poverty, malnutrition, instability and lower standards of living in comparison to developed countries. The newly independent countries were enmeshed in an international capitalist economy which was advantageous for the colonial powers. Neocolonialism, a term coined by Ghanaian independence leader Kwame Nkrumah, referred to the continued exploitation and indirect political control of former colonies (Burnell 2009). The Cold War conditions further created new forms of dependence for the newly independent states, which were economically weak and politically nascent, in the global rivalry between the East and the West.

The process of decolonization took place at the same time as the Cold War, with both sides seeking power and influence. Decolonization process and the discourse about postcolonial political and economic development was integral to the Cold war (Schulz 2008: 314). Many newly independent countries including India attributed their underdevelopment to colonial exploitation. In order to protect the hard won freedom and to focus on the task of economic development, India among other states needed to avoid being dominated again or entangled in costly military competition due to the cold war polarization. Some of these states took refuge in a Non Aligned foreign policy that developed out of the discussions that began at the Bandung Conference in 1955. The United States for reasons owing to the Cold War saw the NAM as immoral and cowardly. But the anti-imperialist commitment of the Soviet Union helped it become a natural ally for the developing world's struggle against the West (Schulz 2008: 314).

European colonization was a novel experience for the colonies. The economic exploitation and political control required the subjugation of people which was achieved through racial superiority theories about the civilizing mission of Europe. The organizing principles of the modern state were unlike anything seen before. The colonial state combined enormous coercive powers without the necessary limitations on its actions. In the pursuit of its economic ends, colonial powers set up a system of government that was geared towards the continuation of exploitation of resources. The colonial enterprise itself generated conditions that lead to the development of independence movements and liberation movements in the colonies. Scholars see decolonization (Betts 2012) as a result of military confrontation for liberation movements and diplomatic negotiation between the colonial power and the colonized for independence movements. The colonial past and education practices lead to the process of resistance being conducted in terms of European ideas. Thus, the nationalists in the colonies understood the challenges they faced in terms of the cultural and social values of the modern European state.

The postcolonial nation-states replicated the forms of the modern state in the West. The new states had to deal with problems of underdevelopment and political survival. In order to create a strong nation-state, the people were to be transformed into a nation, towards these ends; modern states incorporate contiguous, alien territories and peoples, blurring the distinction between imperialism and nationalism, leading to conflicts and alienation of people (Duara 2004). In many states, decolonization lead to internal conflict and colonial

successor states came into conflict with each other as a result of territorial claims or regional rivalry (Darwin 1988).

Imitative of the nationalism of the West, nationalists of colonies justified the process of mobilization and transformation of the people into a homogenized group, often through violent transformation (Duara 2004). The dominant narratives of national belonging prioritized itself and made claims to sovereignty in the name of deep traditions or ancient civilization and thereby, subordinated other claims for justice and equality to the nation (Duara 2004). Further, the colonial state created new categories of people, through census and enumeration, for the purposes of governance and to establish their power through a policy of divide and rule. This was accompanied by the broader discourse of the rights of a people or a nationality which has a right to a territory and therefore a state of its own. This is the discourse at the base of decolonization and while it enabled decolonization, this discourse also divided the movement as it created ethnic tensions and led to demands of nationality rights and territorial nation-state for other ethnic groups.

5.4 Nation-building

One of the key challenges for third world nationalists was to fashion the people of their society into a 'nation'. The processes through which a people would be transformed into a nation is termed nation building. The nation-building project was important not only to legitimize their claim to fight the colonial power and but also in the formation of their own state.

In order to understand nation-building, we will briefly examine the concepts of state and nation. The world is divided into states. States are autonomous institutions in a populated territory with a legitimate monopoly of violence and extraction within its borders and sovereign in relation to those outside its borders. A nation, on the other hand, is a self defined community in a distinct territory with shared culture, a common ideology, customs, institutions and a sense of homogeneity. Often the terms state and nation are erroneously used interchangeably. A state can claim to be a nation, only when it contains one nation in its territory, the term nation-state is said to describe a territorial-political unit (a state) whose borders coincide with the territorial distribution of a nation (Connor: 382). But a nation is not a state, where/when nations develop; they make efforts to establish their own state. At any given time in the world, there are more nations than there are states.

We have discussed that postcolonial states were shaped by the process of decolonization as new states were created and the borders were changed. The shape and content of postcolonial states were determined by the requirements of the colonial power. In the west, state-building (building of state institutions) and nation-building (creation of the nation) took shape over a long period of time as modern states grow out of erstwhile multinational empires and centuries of religious, social and political developments. The nation was formed and defined and the nation made efforts to create the state. In contrast, for most of the postcolonial states, it is the state which comes into being first and then tries to build the nation, state building preceded nation-building. The third world countries also had to face external pressures of the Cold War and internal pressure due to conflict between the various 'nations' existing within its borders, as nation-building presupposes the forming of a 'nation' can be constituted in different ways.

Hippler defines, nation building as a process of sociopolitical development (usually over a long historical period) that allows loosely linked communities to become a common society with a nation-state corresponding to it (2004). Nation building processes are difficult to predict and involve different dimensions and instruments, such as economic, cultural integration, political centralization, bureaucratic control, military conquest or subjugation, creation of common interests, democratization and establishment of common citizenship or repression and even acts of ethnic cleansing (Hippler 2004).

Nation building is an open ended process, in which individuals compete to interpret the concept of the nation, through which people believe state institutions as belonging to them, thereby conferring legitimacy. Legitimacy creates a sense of ownership with regard to a collective. If there is a lack of belonging or legitimacy in the sense of nation, there will be efforts to secede or to try to capture the state to establish the possibility of identification (Grotenhuis 2016).

State building on the other hand is the construction of a state apparatus defined by its monopoly of legitimate use of violence in a given territory (O'Dwyer 2016). Thus, nation building deals with nationhood and state building is focused on the technical and institutional aspect. The term 'nation-building' is also used in the context of violent conflicts which lead to state failure. In this usage, nation-building is a political objective as well as a strategy for reaching specific political objectives. The two terms nation building and state building are sometimes used interchangeably. In literature from the United States, nation building is referred to as state building or the suggestion is that nation-building is an instrument for state-building (Grotenhuis 2016). However, apart from the political-cultural aspect, there are also practical requirements for this: nation-building needs a 'national' infrastructure, transport and communication infrastructure, a 'national economy', nationwide mass media for establishing a national political and cultural discourse. Thus, a crucial component of nation-building is the development of a state apparatus that can actually control its national territory. The state becomes the political organisational form of a society in the social integration process. *State-building* is a core aspect of successful nation-building as it creates institutions and administrative unity that are effective and accepted throughout the country. The state needs to promote loyalty to the 'nation' and must assert its monopoly of force over the entire national territory in order to be successful over the long term. (Hippler 2004)

Some scholars believe that nation-building took place in the context of the East–West conflict of the Cold War and constituted a Western strategy for containing socialism and the Soviet Union in the Third World. According to Hippler, "Nation-building was intended to represent an alternative to the victory of liberation movements and the 'revolution'…" (2004). 'Nation-building' was related to modernization theories, which viewed the development process in the Third World in terms of catching up with Western models. Thus, third world societies would be 'modernized' to resemble the West and 'traditional' societies would turn into 'modern' nation-states (Hippler 2004).

5.5 Post-Colonial State

Decolonization led to the creation of a large number of new states. The United Nations was founded in 1945 with 50 members, by the end of the 1960s, the number of member states increased to 127. The state

is a central concept in the study of politics. Often, politics is understood as the study of the state and the nature of state power is one of the central concerns of political analysis. The state is a sovereign territory with public institutions, the decisions of the state are binding on the society and finally, the state is an instrument of domination. The state 'shapes and controls… [Or] regulates, supervises, authorizes or proscribes' (Heywood 2013) every aspect of human activity. We have established in the previous sections that the post-colonial states are different from the European state and have their own peculiarities owing to the specificities of their origin.

The state is a historical institution that emerged in Europe. The treaty of Westphalia, established the state as the principal actor in domestic and international affairs, in the 17th century, when it formalized the modern notion of statehood. The state has since evolved and the European State model spread to the rest of the world through the process of decolonization. The state is now the universal form of political organization.

Since the state is a central focus of political analysis, there are disagreements about its origins, development and impact on society. There is a debate among the rival theories about the nature of state power. The liberals see the state as a 'neutral arbiter among competing groups… it is an umpire or referee…represents…public interest' (Heywood 2013: 61). In application to postcolonial states, liberalism would aver that westernized elites use the instruments of the state to transform traditional agrarian society to a modern industrialized society. But liberal theory fails to explain why elite groups would raise above their narrow economic and social interest. The Marxists argue that the state should be seen in the 'context of unequal class power' and acts 'either as an instrument of oppression' of the dominant class or 'as a mechanism through which class antagonisms are ameliorated/state is an instrument of the ruling class/state is constrained by the structure of the capitalist system'(Heywood 2013). The postcolonial state is different from the developed state that the Marxists focus on in two ways: colonial exploitation continued after decolonization in the garb of neocolonialism and the absence of a single dominant class. The economic exploitation of the colonies had disrupted the course of development resulting in underdevelopment. Dependency theorists argue that the world is dominated by a worldwide capitalist system and the developed countries comprise the core while the developing countries, the periphery. The colonial policies have made the developing countries dependent and integrated to the core countries in a relationship of inequality.

States fulfill different kinds of roles. We can think of developmental states that promote economic development, welfare states that rectify the imbalances and injustices of the market economy and totalitarian states, an all embracing state where everything is under state control among others.

Postcolonial states are objects of focus for scholars for the salience of their political and economic processes. It needs to be emphasized that at any given time, it is in the postcolonial states that we see the most number of violent conflicts. The postcolonial state had many problems owing to the circumstances of their origin. We have discussed how the territorial contours of postcolonial states were determined by the imperial proclivity of colonial powers. We have also discussed how the process of decolonization influenced the specific state structure that came into being.

We can trace the problems of the post colonial state to the challenges of both nation-building and state building. Many states in the postcolonial world are seen as weak and failing or collapsed states as often state

structures are not well developed to fulfill functions of the state, leading to their reduced ability for effective governance and ill-equipped to address concerns of citizens (Henderson 2008: 260). These states are portrayed as 'quasi-states' or failed states' and fail to maintain domestic order and civil strife is common. The failure of states stems from their experience of colonialism, in terms of their creation and that they bore little relation to the concept of the nation and the borders of such states were artificial (Kothari 2008: 1029). Cultural diversity within postcolonial states provided a basis for mobilization based on identity in support of each group's struggle for the share of the power, leading to intractable ethnic conflicts that explain the instability of post-colonial states and the resultant secessionism or civil war (Henderson 2008: 260). The European nation-state that spread to the rest of the world through the colonial process influenced the development of the state. The identification of the state with a nation created impetus for state policies to create such a nation that marginalized or discriminated against other communities or it lead to other groups seeking their own states through a secessionist movement. Postcolonial states had to simultaneously build both state institutions and a national consciousness among the diverse groups inhabiting the territory. Since their creation, post colonial states have an ultimate end, development and modernization, to be as good as the other states in the world system (Kohli 1987: 25). Modernization involved the new local elites who continued with the development processes after decolonization and create hierarchical relationship with the people of the hinterland or indigenous groups who wish to remain distinct as 'backward' legitimating them as targets for forced assimilation, relocation and state violence (Wilmer 2008: 989).

The three attributes of the postcolonial state, which make them distinct are that, it is overdeveloped, it is autonomous from dominant classes and subservient to the interests of the international capital (Alavi 1972). The overdeveloped state is a reference to the legal institutional state structures created by the colonial state for their domination and exploitation of the colonies. These state structures are inherited by the postcolonial state and do not reflect social forces of their location. Postcolonial states, argued Hamza Alavi, are 'overdeveloped' with powerful bureaucracies and armies that had been the instruments of colonial domination. In many countries, the political system had to rely on the army and the bureaucracy to govern, in these circumstances, the military-bureaucratic oligarchy effectively controlled the state weakens democratic institutions. The postcolonial states were said to be overdeveloped and economically dependent of international capital at the same time enjoying relative autonomy from social classes as the agrarian and industrial classes were underdeveloped. Since there is no single dominant class in the postcolonial world, the state is autonomous to regulate its relationship the alliance of classes that dominate it. Finally, the underdeveloped economy and the weak dominant classes in the postcolonial state make them open to the influence of foreign capital.

In the immediate years after the end of the cold war, with the rise of forces of globalization, there were debates about the retreat or the decline of the state as state authority having been undermined by the global market, multinational corporations, non-state actors and international organizations. Developments after the 9/11 terror attacks appear to have helped to strengthen the state with the rise of transnational terrorism due to the state's function to maintain domestic order and protect its citizens. Counter terrorism strategies have lead to states assuming wider powers at borders, surveillance and even detention. The overdeveloped postcolonial state helps the world markets in integrating the third world into the global market place through

liberalization policies. In these circumstances, the postcolonial states face new challenges and are seen as 'competition state' competing with each other to attract global capital as they race to the bottom as they become increasingly dependent on global capital (Rai 2009).

5.6 Conclusion

In this unit, we have discussed decolonization, nation-building and the postcolonial state and their relationship with each other. It bears to mind that while the postcolonial states created in the process of decolonization have certain commonalities owing to their colonial past, there are significant differences among them. There were also differences in the institutional structure of colonialism. The end of colonialism is a landmark development in the development of a more equal world. It has helped the majority of the world shape their own destiny. However, it is also true that owing to the dynamics of nation-building in these postcolonial states, there are nations at war to control the state, to secede and form their own state and neighboring states conflict to control territory or expand their influence. The postcolonial states fulfill their obligations to their citizens in varying degrees owing to their infrastructural (political and economic) capacity. The state machinery of the postcolonial state dominates its society owing to its institutions being colonial in origin and does not reflect the social dynamics of its location.

5.7 Self Assessment Questions

1. What is the difference between describing decolonization as an event and decolonization as a process?
2. What do we mean by decolonization of the mind?
3. What is the importance of the Bandung Conference in the process of decolonization?
4. How did imperialism continue after decolonization?
5. What is the difference between state-building and nation-building?
6. What is the difference between nation and state?
7. How are postcolonial states different from European States?
8. Why is the postcolonial state said to be overdeveloped?
9. What are the theoretical debates about the nature of state power?

5.8 Suggested Readings

(a) Betts, R. (2012). Decolonization: A Brief History of the World. In E. Bogaerts, & R. Raben (Eds.).*The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s-1970s*. Brill.

(b) Heywood, A. (2013). *Politics.* Palgrave.

(c) Alavi, H. (1972). The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh.*New Left Review, 1* (74), July-August. 59-81.

(d) Duara, P. (Ed.). (2004). *Decolonization: Perspectives from Now and Then*. Routledge.

(e) Hippler, J. (Ed.). (2004). *Nation-building: A Key Concept for Peaceful Conflict Transformation?*. Pluto Press.

(f) Burnell, P. (2009). Imperialism. In I. Mclean& A. Mcmillan(Eds.), *Oxford Concise Dictionary of Politics* (3rd ed.). Oxford University Press.

(g) Schulz, B. (2008). Cold War. In L. R. Kurtz (Ed.), *Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict* (3rd ed.). Elsevier Science.

(h) Connor, W. (1978). A Nation is a nation, is a state, is an ethnic group is a ….*Ethnic and Racial Studies, 1* (4), 377-400.

(i) Grotenhuis, R. (2016). *Nation-building as Necessary Effort in Fragile States*. Amsterdam University Press.

(j) Henderson, E. (2008). Civil Wars. In L. Kurtz (Ed.), *Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict*(3rd ed.). Elsevier Science.

(k) Kothari, Rajni. (2008). Institutionalization of Violence. In L. Kurtz (Ed.), *Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict*. Elsevier Science.

(l) Kohli, A. (1986). Introduction. In A. Kohli (Ed.), *The State and Development in the Third World: A World Politics Reader.* Princeton University Press.

(m) Kohli, A. (1987). *The State and Poverty in India: The Politics of Reform.* Cambridge University Press.

(n) Wilmer, F. (2008). Indigenous People's Response to Conquest. In L. Kurtz(Ed.), *Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict*. Elsevier Science.

(o) Rai, Shirin. (2009). Postcolonial states in Imperialism. In Mclean, Iain and Mcmillan, Alistair (Eds.), *Oxford Concise Dictionary of Politics*. Oxford University Press.

(p) Stearns, P. (2008). *The Oxford Encyclopedia of the Modern World*. Oxford University Press.

(q) Darwin, J. (1988). *Britain and Decolonisation: The retreat from empire in the post-war world.*Macmillan.

(r) Smith, A., &Jeppesen, C. (Eds.). (2017). *Britain, France and the Decolonization of Africa: Future Imperfect*. UCL Press.

C.C : 3.1

Unit-6

Cultural Pluralism and Ethnic Conflict

Contents

6.1 Objectives

6.2 Introduction

6.3 Ethnicity

6.4 Cultural Pluralism

6.5 Types of Ethno- cultural Divisions

6.6 Cultural Pluralism and Ethnic Conflicts

6.7 Theoretical Models on Ethnopolitics

6.8 Levels of Ethnic Conflict

6.9 Methods of Conflict Resolution

6.10 Conclusion

6.11 Self Assessment Questions

6.12 Suggested Readings

6.1 Objectives

The objective of this unit is to familiarize the students with

- The concept of ethnicity and cultural pluralism
- To discuss the various factors behind the divisions within society
- To discuss the different types of conflict in culturally pluralist societies
- To discuss the methods of conflict resolutions

6.2 Introduction

One of the major concerns in comparative politics is related to the political development and political instabilities created within culturally plural societies especially in the less developing or the newly emergent nations in the countries of Asia, Africa, and Latin America. Usually, industrialized and advanced democracies do not seem to have such conflicts but it is one of the major concerns in the developing nations which are ethnically diverse. “Cultural pluralism i.e., ethnic diversity,” notes Crawford Young, “is a quintessentially modern phenomenon.” It has been closely linked to the evolution of the middle class and the rise of politicians.

In order to mobilize workers and peasants, they often articulated nationalist or other ethnic aspirations. This escalation of hostilities hinging on ethnic, racial, and cultural factors during the twentieth century led to the questioning of, not only the several assumptions of modernization theory but also challenged the "contact hypothesis." According to the hypothesis, as more and more people belonging to different races, religions, and ethnicities came into greater contact with each other, they would be in a better position to appreciate and understand the other groups' common human qualities thereby resulting in the reduction of prejudice. It has been observed that as the interaction between different ethnic groups increases, induced by factors such as urban migration, frequently intensifies hostilities. In some cases, such as observed in Rwanda and Bosnia, group violence took on a shape of its own despite years of close interethnic contact and intermarriage, neighbors and even relatives by marriage. In cases where the political and economic systems were found to be biased in favor of one ethnic group, this trend was visible. It can also be seen happening when the ethnic leaders inorder to advance their political agendas play on their followers' prejudices. Resource competition in regions that are densely populated and have a lot of poor people experience conflict. Especially when resources are scarce, we often witness conflicts as was the case in the Niger Delta in Nigeria after the upsurge in oil production and the discovery of uranium deposits.

6.3 Ethnicity

Scholars maintain that human beings have an inherent desire of 'belongingness' which is a deeply rooted social and psychological need to create an 'us' to distinguish oneself from 'them'. Moreover, some argue that ethnic conflict is not extraordinary but emerges out of the more ordinary needs, behaviors, and daily interactions that characterize everyday life. Although it is difficult to define ethnicity most scholars agree that ethnic identity is a social construction. It can be defined as the way that certain groups look at themselves over time as separate from others. Each ethnicity shares "a distinctive and enduring collective identity based on a belief in common descent and on shared experiences and cultural traits." Elements like 'real or imagined common history, tradition, and values' binds a group of people into one by distinguishing them from their neighboring ethnicities, sometimes giving rise to ethnic conflict**.** Also, it has been found that during uncertainty or crisis, intellectuals and politicians are likely to create historical myths that give their ethnic group a sense of security in the face of perceived external challenges**.** Usually, ethnic consciousness creates barriers between groups when two or more ethnic groups live near each other. However, not all proximities create conflict, it is how the society at any given point of time manages the conflict that is the deciding factor.

6.4 Cultural Pluralism

Cultural pluralism is a term used when smaller groups within a larger society maintain their unique cultural identities, whereby their values and practices are accepted by the dominant culture, provided such is consistent with the laws and values of the wider society. Kallen is widely credited as being the originator of the concept of cultural pluralism. His 1915 essay in The Nation, titled "Democracy versus the Melting Pot",

was written as an argument against the concept of the 'Americanization' of European immigrants. He coined the term cultural pluralism, itself, in 1924 through his Culture and Democracy in the United States. In 1976, the concept was further explored by Merwin Crawford Young in The Politics of Cultural Pluralism. Young's work, in African studies, emphasizes the flexibility of the definition of cultural pluralism within society. Pluralistic societies place strong expectations of integration on members, rather than expectations of assimilation. The existence of such institutions and practices is possible if the cultural communities are accepted by the larger society in a pluralist culture and sometimes require the protection of the law. Often, the acceptance of a culture may require that the new or minority culture remove some aspects of their culture which is incompatible with the laws or values of the dominant culture. Cultural pluralism is distinct from multiculturalism, which lacks the requirement of a dominant culture. If the dominant culture is weakened, societies can easily pass from cultural pluralism into multiculturalism without any intentional steps being taken by that society. If communities function separately from each other or compete with one another, they are not considered culturally pluralistic.

6.5 Types of Ethno-Cultural Divisions

Communities may be guided by different understandings of identity shaped by diverse factors that are discussed below:

Nation and Nationality

The most significant political expressions of ethnicity have occurred where it has become the building block of nations seeking either self-determination or to preserve their ethnic purity." The term nation denotes a population with its language, cultural traditions, historical aspirations, and, own territory'. Often, nationhood is related with the belief that "the interests and values of this nation take priority over all other interests and values." Nationalities frequently claim sovereignty over a specific geographic area but these proposed national boundaries often may or may not coincide with those of sovereign states (independent countries). The most critical basis for national identity is the preservation of a distinct spoken language. Chinese speakers who live in different countries of Southeast Asia have maintained their own cultural and political organizations and feel strong emotional ties to China. However, most immigrants including Chinese to countries such as the United States, Canada, and Australia have fully assimilated into their new language and culture, dropping their language of origin after one or two generations. It is observed that their original national identity loses much of its political and social impact.

Nationality becomes politically important only when its members believe that their common history and destiny distinguish them from other ethnicities in their country. "In their more limited manifestations, nationalist movements simply seek to preserve the group's cultural identity and promote its economic and political interests." Nationalist movements become more challenging when they seek to create a separate nation-state of their own. Such separatist movements can arise when an ethnic minority is concentrated in a particular region of the country and represents a majority of the population in that area. For example, in Sri Lanka, where the Tamil-speaking population is concentrated in the country's northern and eastern provinces,

particularly the Jaffna Peninsula region in the far north, the Tamils kept themselves apart from other ethnicities inhabiting the island. The British conquest and colonization of the entire island produced a nationalist reaction among the majority Sinhalese (Sinhala-speaking) population, which, in turn, provoked friction between them and the Tamil minority.

Tribe

In India, Vietnam, Burma, and other parts of Asia, tribe refers to hill peoples, such as the Laotian Hmong, who live traditional lifestyles in relative isolation from modern society. The term has also been used, of course, in discussions of North American Indians, as well as the lowland (Amazonian) Indians of South America.

Presently the tribal (or sociolinguistic) identifications tend to be the major determinant of support for political parties in Africa. Other variables—such as age, urban versus rural origin, and education—also play a role and sometimes reduce (though not eliminate) the influence of tribe. The intertribal conflict has frequently sparked violence in sub-Saharan Africa, affecting more than half the countries in that region at one time or another. Nigeria, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Uganda, Sudan, the Congo, and Ivory Coast, among others, have been torn apart by civil wars that were partially ethnically based. In Liberia, Angola, and Mozambique, conflicts began about other issues were aggravated by tribal divisions. Unfortunately, the Nigerian conflict was but one of the earliest ethnically based civil wars in the African continent. Some of the most intense and prolonged tribal conflicts took place in the former Belgian colonies of Burundi and Rwanda in the Great Lakes region of eastern Africa.

Race

Crawford Young observes that "there was no common sense of being 'African,' 'European,' or 'Indian,' before the creation of multiracial communities by the population movements of the imperial age." It was only when people started living together in multigroup settings that race became a critical marker. South Africa since its colonization by the British until its 1994 transition to majority rule was ruled by a White minority. This minority constituting only about 15 percent of the population ruled over the Blacks, the majority population, who were denied fundamental legal and economic rights, including the right to vote or hold political office. Until the government renounced it in 1991, the legal centerpiece of South African racial policy was apartheid (separateness). Apartheid officially created racial classifications for the entire population that defied international standards and often fell victim to their logical contradictions. Both Coloureds and Asians enjoyed a higher socioeconomic status and greater legal and political rights than Blacks did, but still ranked considerably below Whites. Whites (15 percent) held virtually all political and economic powers. By the start of the 1990s, President F. W. de Klerk's government, recognizing that apartheid was no longer viable, legalized the African National Congress (ANC), freed Nelson Mandela, and opened the door to a new constitution enfranchising the Black majority and ending the White minority rule.

Religion

It involves deeply felt values, religion has frequently been the source of bitter "communal strife" (i.e., the conflict between ethnic communities). a group's religious orientation often shapes 'its political beliefs, including

its ideas regarding a citizen's political rights and obligations as well as its understanding of the country's constitutional and legal systems. the potential tension or even conflict between religious groups (defined here as ethnic communities) living in the same country.' Such discord may put one religion against another or, may involve conflict between two branches of the same religion. Two factors influence the likelihood of tensions between religious groups: first, the extent to which one religious community feels ill-treated by another; and, second, the degree to which any religion regards itself as the only true faith and rejects alternate theologies.(Handelman 2011)Thus, Catholics and Protestants coexist rather harmoniously in the United States and Germany because neither of these conditions applies. On the other hand, in Northern Ireland, where Catholics have resented the Protestants' political and economic powers and Protestants have feared political domination by the larger Catholic community, paramilitary groups representing both sides engaged in a nearly 40-year armed struggle. India and Pakistan were born of communal violence, and neither has been free of it since. Lebanon, from 1975 to 1990 and again in 2006–2008 was also a battlefield for warring religious factions.

6.6 Cultural Pluralism and Ethnic Conflicts

Western scholars especially modernization scholars, assumed that improved education and communications in the Third World would break down ethnic conflicts. They opined that socioeconomic modernization enhances ethnic integration and harmony. Gabriel Almond and G. Bingham Powell, depicting modernization as a rather inexorable force, contended that "the forces of technological change and cultural diffusion are driving political systems in certain directions, which seem discernible and susceptible to analysis in terms of increasing levels of development." Others envisioned modernization as a process of getting developing nations to think and act "more like us" (i.e., the West). "As time goes on," Marion Levy predicted, "they and we will increasingly resemble one another. [The] more highly modernized societies become, the more they resemble one another." Yet in Africa and Asia, early modernization has frequently politicized and intensified ethnic antagonisms. Crawford Young observes that "cultural pluralism (and ethnic strife) as a political phenomenon" was not significant in traditional societies but, rather, emerged "from such social processes as urbanization, the revolution in communications and spread of modern education." Early modernization theorists, who were quite optimistic about the positive effects of literacy, urbanization, and modern values, clearly underestimated the extent to which these factors might mobilize various ethnic groups and set them against each other. Dependency theorists, provided a rather superficial analysis of ethnic issues, tending to blame conflicts on colonialism or neo-colonialism.

During the period of European colonialism, ethnic divisions in Africa and Asia were often overshadowed by the struggle for independence, which encouraged a common front against the colonial regime but soon after independence, however, previously submerged ethnic rivalries frequently rose to the surface. In the new political order, groups competed for state resources . Further these newly mobilized citizens identify primarily with their caste, religion, nationality, or tribe, their recently acquired political awareness often produces clashes with other ethnicities. The spread of higher education, rather than generating greater harmony, frequently

produces a class of ethnically chauvinistic professionals and intellectuals, who become the ideologists of ethnic hostility. In time, as these groups come to know each other or as ethnic identities take on more conciliatory forms, these tensions may diminish. For now, however, the ethnic conflict remains a potent phenomenon in the Third World.

Just as colonialism and modernization challenged traditional religious, national, and tribal identities, the economic and social forces of globalization may pose an even greater challenge. As international business conglomerates spread their brand names and associated cultural habits throughout the developing world, they bring a certain homogenization of world culture. This often weakens traditional ethnic practices and values. Although it is assumed that the spread of Western world brands will eventually reduce or eliminate the differences in dress, food, and customs that currently separate different ethnic groups but the reality is otherwise. The vision of globalized culture has often created a nationalistic or ethnic backlash and widened tensions between neighboring ethnic communities.

6.7 Theoretical Models on Ethnopolitics

The three theoretical models that have addressed the study of ethnopolitics during the last century focus on three separate but not always clearly distinguished themes. The primordial theory views ethnicity as a natural trait rooted in the individual's birth into an ancestral gene pool or shared cultural network. It centres on the origin and durability of ethnic identity. As such, it is similar to but not entirely dependent on the narrow, biological definition of ethnicity. The constructionist theory is more about the adaptability of ethnic identity as a means of explaining its durability. Related to the broad definition of ethnicity we are employing here, constructionism treats ethnicity as an evolving concept in which, "over time and space, economic, political and religious structures emerge with specific configurations that may be labeled ethnic." In contrast to both primordial and constructionist theory, instrumentalist theory focuses on the utility of ethnic identity as a tool of politics, used in a similar fashion by both individuals and groups in order to achieve their personal agendas. Here, the emphasis is on political leaders—political entrepreneurs and demagogues who mobilize communities around perhaps latent or forgotten ethnic identities and grievances—not the groups themselves, and the area of concern is the political process, not the historical origin of the group or the changing environment in which it exists or defines itself. The failure to differentiate among the central concerns of these explanations of ethnicity and ethnopolitics has occasionally led to their use on an "either-or" basis. A more fruitful approach would be to view them in a "where," "when," and "how" manner. (Rudolf, 2006)

6.8 Levels of Ethnic Conflict

Although most countries are ethnically heterogeneous, there are wide variations in how different ethnicities relate to each other. It is often shaped by the political landscape of a particular country. It is dependent on when the ethnic consciousness converts into ethnonationalism, a term coined by Walker Connor. "Most African and Asian nationalisms imagined a community from culturally diverse populations whose shared

historical experience was colonial oppression. To transform from the ideology of anti-colonial revolt into the doctrine of post-colonial state legitimation, such nationalism was compelled to assert an exclusively territorial referent, and deny any ethnic attachments." (Young 1976) Those communities who fell out of the dominant identity became the national minorities. Failure to compete and bargain with the state for a fair share of the resources often transformed into ethnic conflicts. However, ethnic differentiations do not automatically lead to conflicts. It operates at the individual and group level whereby if the community has got assimilated with the dominant community, it is found that ethnic community consciousness and conflict potential gets reduced.

According to Handelman (2011), the nature of the relationship between the different ethnic communities usually shows the following tendencies.

i) Relative Harmony

Modernization often intensifies ethnic antagonisms in the short run, but usually betters them in the longer term. It is also presumed that affluent democracies are more likely than less affluent countries to enjoy amicable ethnic relations. Relative ethnic harmony is less common in developing countries. The countries classified as harmonious are only categorized that way relative to other, more sharply divided societies. They continue to have some glaring examples of ethnic discrimination and tension. Canada, in many ways a more successful melting pot than the United States, has not resolved the problem of French separatism in Quebec. But such tensions are the exception, and conflict is rarely violent.

ii) Uneasy Balance

Countries such as Trinidad-Tobago and Malaysia, offer an example of uneasy balance. Although still generally peaceful, interethnic relations are uneasy. balance, in which different groups predominate in specific areas of society. For example, in Malaysia, the Muslim Malay majority dominates the political system, including parliament and the government bureaucracy, while the Chinese minority dominates the private sector. Race riots in 1969 led the Malaysian government to introduce a "New Economic Policy" designed, in part, to redistribute more of the country's wealth to the Malays. Fearful of Chinese domination, the Malays have benefited from a system of ethnic preferences in education and civil service. However, interethnic relations may soon be tested as the Malaysian government has announced plans to sharply reduce these preferences. The Caribbean nation of Trinidad and Tobago offers another example of an uneasy balance. During the second half of the nineteenth century, British colonial authorities encouraged the migration of indentured plantation workers from India who joined the Black majority and the small White elite. Contrary to the common Caribbean practice of extensive racial mixing, there was a less interracial marriage between Blacks and East Indians (immigrants from India), at least until the twentieth century. Each group currently constitutes about 40 percent of the population, with the remaining 20 percent made up of Chinese, Whites, Arabs, and others. Following Trinidadian independence in 1962, ethnic frictions increased as Blacks and East Indians competed for state resources. Most of the important political, civil service, military, and police positions since that time have been held by Blacks, who predominate within the urban middle and working classes. Whites continue to predominate in the upper ranks of the business community. Traditionally, most East Indians have been either small to medium-sized business people (with significant collective economic power) or poor farmers and farm workers.

iii) Ethnic Dominance

One important factor permitting ethnic balance in countries such as Malaysia and Trinidad-Tobago has been the division of political and economic powers between the different ethnicities. Typically, one ethnicity predominates in the political arena and the other is more influential in the economy. But, in enforced hierarchies, both forms of power are concentrated in the hands of the ruling ethnic group. South African apartheid represented the most blatant example of such a relationship. Through the 1980s, Whites dominated both the private sector and the state, including the courts, police, and armed forces. Blacks were denied the most basic rights.

iv) Systematic Violence

Ethnic resentments have sometimes led to mass violence or even civil war. As we have seen, in several Third World countries as well as in some European nations, systematic violence has resulted in thousands or hundreds of thousands of deaths and huge numbers of displaced refugees and rape victims—in Myanmar, Bosnia, Lebanon, India, Bangladesh, Ethiopia, Nigeria, Rwanda, and Sudan, among others. Often, as with enforced hierarchies, violence develops when ethnic divisions are reinforced by class antagonisms. Muslim antipathy toward Lebanon's Christian community has been fueled by Christian economic superiority. Similarly, in Nigeria, many Islamic northerners resent the economic success of the Christian Ibos. Ethnic bloodshed sometimes occurs when one ethnicity seizes political power and then takes retribution for real or imagined past indignities.

6.9 Methods of Conflict Resolution

Whether ethnic resentments arise 'from competition over government resources, resentment over the division of political and economic powers, or an ethnic community's demands for greater autonomy, there are several possible results.' Although some outcomes are peaceful, others may result in intense violence. It is, however, the management of the crisis and the maturity shown by the political elites of a particular country that determines the outcome. The different methods of conflict resolution as witnessed in diverse situations are discussed in the following sections.

i) Power-Sharing Arrangements:

Power-sharing arrangements are designed to create stability by constitutionally dividing political power among major ethnic groups. Federalism, the primary form of power-sharing, is "a system of government [that] emanates from the desire of people to form a union without necessarily losing their various identities." It may involve the creation of autonomous or semi-autonomous regions, each of which is governed by a particular ethnicity. It is only possible in situations where contending ethnic groups are concentrated in different regions of the country. Industrialized democracies have had greater success with ethnically based federalism than less developed countries.

Consociationalism offers another potential solution to ethnic conflict. It tends to be used where major ethnic groups reside nearby and have no particular "homelands." Consociational democracy in plural

(multiethnic) societies involves a careful division of political power designed to protect the rights of all participants. It involves the following components: i) The leaders of all-important ethnic groups must form a ruling coalition at the national level. ii) Each group has veto power over government policy, or at least over policies that affect them. iii) Government funds and public employment, such as the civil service, are divided between ethnicities, with each receiving several posts roughly proportional to its population. iv) Each ethnic group is afforded a high degree of autonomy over its affairs**.** (Lijphart)

Thus**,** 'consociational democracy consciously rejects pure majority rule. Instead, it seeks to create a framework for stability and peace by guaranteeing minorities a share of political power—even veto power—to protect them against the majority.' It has been tried in several developing nations, including Cyprus (where it failed) and Malaysia (where it has generally succeeded). Some degree of mutual trust and cooperation between the leaders of contending ethnic groups is the key to effective consociational arrangements.

ii) Secession

When power-sharing or other forms of compromise do not succeed, discontented ethnic minorities may attempt to secede (withdraw) from the country to form their nation or join their ethnic brothers and sisters in a neighboring state. Ralph Premdas(1991) indicates that these movements have several characteristics: (i) An ethnic group—defined by factors such as language, religion, culture, or race—claims the right of self-determination (independence); (ii) the ethnic community has a defined territorial base that it claims as its homeland; (iii) there is almost always some organized struggle.

Central governments, faced with such breakaway efforts, almost always try to repress them because they are unwilling to part with some of their country's territory or resources. Although many aggrieved Third World nationalities would like to secede, few have accomplished that goal. Bangladesh is one such example.

iii) Outside Intervention

Such intervention can range from simply agreeing to take in refugees to an armed intervention aimed at putting a stop to the bloodshed. However, leaders of outside nations may at times be constrained from involvement due to international law (concerning national sovereignty), international power alignments, lack of resources, or fear of alienating their citizens. Even the nonaggressive act of offering refuge to the victims of ethnic strife and persecution may seem too costly, too risky, or too unpalatable to the home country's population.

iv) Settlement through Exhaustion

One of the most common types of outside intervention has come from a neighboring country that supports an ethnic rebellion, thereby enhancing the conflict rather than containing it. Ethnic groups (usually minorities) that reside along such borders are far more likely to rebel than those living elsewhere. Proximity to a neighboring country often allows rebel soldiers and their supporters to take refuge from pursuing government troops. In many, if not most, of these cases, the rebelling ethnic group lives on both sides of the border and can take refuge and gain support from their fellow tribesmen or nationals.

6.10 Conclusion

Finally, many ethnic conflicts have been resolved less through statecraft, constitutional arrangements, or external intervention than through the exhaustion of the warring parties. If developing nations are to avoid the horrors of civil war, secession, and foreign intervention, they must arrive at legal, political, and economic solutions that can constrain ethnic tensions. That goal, though reasonable, is more easily articulated than achieved. More difficult still is the task of repairing the damage done to plural societies that have been torn apart by bloody conflict (e.g., Rwanda, Iraq, Kashmir, and Lebanon) or by decades of prejudice and segregation (South Africa). We have seen that, while modern plural societies (such as Belgium and Canada) are ultimately more capable of resolving ethnic tensions peacefully, in the shorter-term early modernization has intensified such conflict in many LDCs. Creating peaceful scenarios for multicultural societies remains one of the greatest challenges facing Third World leaders.

6.11 Self-Assessment Questions

1. Discuss in brief the major basis of ethnic divisions with suitable illustration.
2. Discuss in brief the major theoretical models for understanding ethnopolitics.
3. Examine in brief the various levels of ethnic conflict.
4. What are the different types of conflict resolution measures undertaken in case of ethnic conflict. Answer with suitable illustrations**.**

6.12 Suggested Readings

(a) Handelman, H. (2011). *The Challenge of Third World Development*. Pearson.

(b) Hutchinson, J. & Smith, A.D. (Eds.). (1996). *Ethnicity*. Oxford University Press.

(c) Gurr,T.H. (1970). *Why Men Rebel.* Princeton University Press.

(d) Rudolph, J. (2006). *Politics and Ethnicity*. Springer.

পাঠক্রম : ৩.১

Unit-7

বিশ্বায়ন ও উন্নয়নশীল বিশ্ব

বিষয়সূচি :

7.1 উদ্দেশ্য

7.2 বিশ্বায়ন

7.3 উন্নয়নশীল বিশ্ব

7.4 উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশ্বায়নের বহুমাত্রিক প্রভাব

7.5 মূল্যায়ন

7.6 উপসংহার

7.7 সারাংশ

7.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

7.9 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

7.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- বিশ্বায়নের ধারণা
- উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশ্বায়নের প্রভাব
- উন্নয়নশীল বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা

7.2 বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন এক বহুল প্রচারিত, চর্চিত ও বিতর্কিত ধারণা। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে পঠন-পাঠনের জগতে এই শব্দ এবং ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রজা ও তন্ত্র বইটিতে 'মহাশান্তির পরে বিশ্ব' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'গ্লোবালিজেশন' বা 'বিশ্বায়ন' কথাটি ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে আমেরিকান এক্সপ্রেসের ক্রেডিট কার্ডের বিজ্ঞাপনের দৌলতে প্রথম চালু হয়। এই শব্দটির প্রচলন বা ধারণাটির বিবর্তন নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, সাম্প্রতিক কালে সমাজতত্ত্ব থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আবার ইতিহাস থেকে সংস্কৃতি চর্চা পর্যন্ত এর অবাধ গতিবিধি। বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে।

সমাজবিজ্ঞানী রোনাল্ড রবার্টসন-এর মতে, বিশ্বের সংকোচনশীলতা এবং বিশ্বকে একটি সম্পূর্ণ একক হিসেবে সচেতনতার তীব্রতাই বিশ্বায়নের মূল ভিত্তি। বিশ্বচেতনা ও বিশ্বময় পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এই ধারণাটির প্রধান চালিকা শক্তি। এন্টনী গিডেন্স বিশ্বায়নকে বর্ণনা করেছেন বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের তীব্রতা হিসেবে। তাঁর মতে, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে স্থানীয় ঘটনা বহুদূরের ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয় তেমনি বহুদূরের ঘটনাও বিপরীতভাবে স্থানীয় ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মার্টিন শ'-এর মতে, বিশ্বায়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রক্রিয়ার এক বিচ্ছিন্ন অথবা পরস্পরসম্পর্কিত এক জটিল সমন্বয়—যার মাধ্যমে একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্ব কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হয়। উগান্ডার সমাজবিজ্ঞানী বি. চাঙ্গো মাচিয়ো ওবান্ডার মতে, বিশ্বায়ন হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে পৃথিবীর এক অঞ্চলের মানুষ তাদের আদর্শগত, শিল্পগত ও সাংস্কৃতিক সাফল্যকে অন্যপ্রান্তে নিয়ে যায় এবং যে অঞ্চলে যায়, সেখানকার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সূচীত করে। দীপক নায়ার-এর মতে, বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক মুক্ত পরিবেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতির অঙ্গীভূত দেশগুলির মধ্যে গভীর অর্থনৈতিক সমন্বয়। মার্কসবাদীরা বিশ্বায়নকে পুঁজিবাদের বিকাশের এক নতুন কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষতির মূল কারণ। নয়া-উদারবাদী অর্থনীতিবিদগণ বিশ্বায়নকে রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সম্পৃক্ত করার এক উল্লেখযোগ্য কৌশল হিসেবে বর্ণনা করেছে। তবে বিংশ শতকের শেষভাগে যে বিশ্বায়নের হাওয়া উঠেছে, তার পরিণতিতে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একীকরণ ঘটেছে তা নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সংস্কৃতি, প্রযুক্তিবিদ্যা ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক বিশাল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

7.3 উন্নয়নশীল বিশ্ব

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশই উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশ বলতে মূলত আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের অনুন্নত দেশগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে। মূলত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিরিখে বিশ্বের দেশগুলিকে উন্নত ও উন্নয়নশীল এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। উল্লেখ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে 'তৃতীয় বিশ্ব' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। তবে এই সব দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এক নয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্বেও এই দেশগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশই কোন না কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে ছিল এবং তারা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশই জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা ও উপজাতিগত সমস্যায় জর্জরিত।

তৃতীয়ত, উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নানা সমস্যায় বিব্রত।

চতুর্থত, উন্নয়নশীল দেশগুলি বেশিরভাগই কৃষিনির্ভর এবং অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। সে কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যসূচি পরিচালনা করছে।

পঞ্চমত, উন্নয়নশীল দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষী আচরণের তীব্র বিরোধী এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ষষ্ঠত, উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই আন্তর্জাতিক জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করেছে।

বিশ্বায়ন ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বিশ্বায়ন যা মূলত সমগ্র বিশ্বকে একীভূত করার প্রয়াস, যা কিনা সমগ্র বিশ্বকে একটি ভুবন গ্রামে পরিণত করেছে। যারা বিশ্বায়নের সমর্থক তাঁদের মতে, বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, অগ্রগতি হয়েছে এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই বিশ্বায়নের মাধ্যমেই উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও উন্নয়নের জোয়ার আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে বিশ্বায়নের সমালোচকদের মতে বিশ্বায়নের ফলে যে উন্নতি হয়েছে তা শুধুমাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বিশ্বায়ন কোনোভাবেই সমগ্র বিশ্বে সার্বিক উন্নতি সাধন করতে পারিনি। ১৯৯০-এর দশকের পরবর্তীকালে বিশ্বায়নের যে প্রভাব সমগ্র বিশ্বে পড়েছে তাতে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো। অর্থাৎ বিশ্বায়ন নিয়ে একাধিক পরস্পর বিরোধী নানান বক্তব্য রয়েছে।

7.4 উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশ্বায়নের বহুমাত্রিক প্রভাব

বিশ্বায়ন যে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল দেশসমূহ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই প্রভাবের অবশ্যই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকও রয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে বিশ্বায়নের প্রভাবগুলি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) বিশ্বায়ন, অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বর্তমানে বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নয়া উদারীকরণ প্রক্রিয়া এবং যার মূল উদ্দেশ্য মুক্ত বাজার অর্থনীতি। পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক দেশগুলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য WTO, IMF, World Bank প্রভৃতিকে ব্যবহার করছে। মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা ধনী দেশগুলোর পক্ষে অনুকূল হলেও দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে ক্ষতির কারণ হিসেবেই দেখা দিয়েছে। উদারনীতির নামে ক্রমাগত বেসরকারিকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংখ্যা ও ক্ষমতা হ্রাস, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বিলুপ্তি ঘটিয়ে বহুজাতিক সংস্থার আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা চালায় বিশ্বায়ন। এককভাবে বা যৌথভাবে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতির মাধ্যমে ধনী দেশগুলোর বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশে পুঁজি লগ্নি করে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশের মানুষকে প্রলোভিত করে বিনিয়োগ করার জন্য।

বলাবাহুল্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিশ্বায়নের সুবিধা সঠিকভাবে ভোগ করতে পারছে না। বরং নানা দিক থেকে এই দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে উত্তরোত্তর বৈষম্য বৃদ্ধি হচ্ছে। উল্লেখ্য এই অর্থনৈতিক বৈষম্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত। ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশের মাঝারী, ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অদক্ষ শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর শহরাঞ্চলে এক ধরনের উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তৈরি হচ্ছে যারা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে স্বাগত জানিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের তাবেদারী করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল বিশ্বের সামনে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী শোষণের এক নতুন রূপ যা বাস্তবে নয়া উপনিবেশবাদের নামান্তর। লাইসেন্স প্রথার সরলীকরণ, দ্রুত অর্থের স্থানান্তর, আর্থিক সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বায়নের যে প্রবেশ ঘটেছে তা তৃতীয় বিশ্বের দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি বিশ্বায়নের একপেশে প্রভাবে বিভিন্ন দেশের জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া থমকে গেছে বরং শিক্ষা, ব্যাঙ্ক, বীমা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাচ্ছে। যার ফলে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষজন দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

তবে বিশ্বায়নের ফলে যে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো একেবারেই কোন সুফল পায়নি তা নয়। বিশ্বায়নের মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে আন্তর্জাতিক নিয়োগকর্তাদের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও অনেকখানি অগ্রগতি ঘটেছে। কৃষি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বিশ্বায়ন।

(২) বিশ্বায়ন, সংস্কৃতি ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বিশ্বায়নের ফলে গণতান্ত্রিক ও পশ্চিমা সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। প্রথম বিশ্বের ভোগবাদী সংস্কৃতির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সংস্কৃতি। টিভি, অন্যান্য গণমাধ্যম, ইন্টারনেট, তথা তথ্যপ্রযুক্তির দৌলতে বিশ্বায়িত সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সংস্কৃতিতে। উন্নয়নশীল বিশ্বের লোকসংস্কৃতিতেও বিশ্বায়ন থাবা বসিয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বের লোকসংস্কৃতি বিপন্নতার মুখে। পাশ্চাত্য গান এবং সিনেমার প্রতি তরুণ প্রজন্ম আকর্ষণ বেড়েছে।

তবে এর বিপরীত দিকও আছে বিশ্বায়নের দৌলতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো উন্নত বিশ্বের দেশগুলির সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরিচয় হতে পেরেছে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল বিশ্বের লোকসংস্কৃতি এই বিশ্বায়নের দৌলতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং সমাদৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই প্রক্রিয়াকে অনেকখানি সহজ করেছে তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নতি।

(৩) বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমানে বিশ্বের কোনো দেশ তথ্য প্রযুক্তিকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারছে না। বহু উন্নয়নশীল দেশ ডিজিটাল প্রশাসনিক কাঠামো গ্রহণ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এই নির্ভর এই ডিজিটাল প্রশাসনিক কাঠামো যা তৃতীয় বিশ্বের প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে যেমন অনেকখানি সচল করেছে তেমনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে করেছে স্বচ্ছ ও অনেকটাই দুর্নীতি মুক্ত। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটার পরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক দেশের সাথে অপর দেশের যেমন সম্পর্ক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, পাশাপাশি একটি দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক একক থেকে দূরবর্তী এককগুলোর সংযুক্তিকরণ ও সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমানে ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ প্রভৃতি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ইন্টারনেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে খুব সহজেই সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে। যেক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোও বঞ্চিত নয়। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশে সফটওয়্যারকেন্দ্রিক বিভিন্ন শিল্পতালুক তৈরি হয়েছে যা উন্নয়নশীল বিশ্বের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে অনেকখানি অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে তথ্য প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো কোনোভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তারা এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল এবং উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপরে সুকৌশলে তাঁবেদারি করছে।

(৪) বিশ্বায়ন, পরিবেশ ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সমগ্র বিশ্বে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রক্রিয়া পরিবেশকে যে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সেটাও আজ আর কারো অজানা নয়। শিল্পায়নের পলে প্রচুর বিষাক্ত গ্যাস যেমন গ্রিন হাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে যা বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটানোর জন্য মূলত দায়ী। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী এই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বিশ্বের বহু উপকূলবর্তী এলাকা জলের তলায় তলিয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ। কারণ উন্নয়নশীল

বিশ্বের দেশসমূহে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া খুব বেশি দিন আগে শুরু হয়নি সে কারণে তারা এই দায় নিতে রাজি নন। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহকেই দায়ী করছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর লাগামহীন শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। বর্তমানে পরিবেশগত সমস্যা পৃথিবীর সামনে ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার সমাধান করা কোনোভাবেই একক কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং পারস্পরিক দায়বদ্ধতা।

(৫) বিশ্বায়ন, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বিশ্বায়ন চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা আজও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর মানুষের কাছে অধরাই থেকে গেছে। কারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের মাত্রা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অনেকখানি ব্যয়বহুল করে তুলেছে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো উন্নত দেশগুলো শর্ত মানতে গিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তারা অনেকখানি ভর্তুকি কমিয়েছে। বেসরকারিকরণের কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশ কারণে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এছাড়া অনেক ঔষধের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর পেটেন্ট থাকায় সেগুলোকে অনেক বেশি দামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মানুষকে ক্রয় করতে হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন জটিল চিকিৎসা যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উন্নত বিশ্বের বহুজাতিক সংস্থাগুলি তৈরি করে ফলে সেগুলোর জন্যও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

(৬) বিশ্বায়ন, অসাম্য, হিংসা ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বিশ্বায়নের ব্যর্থতা দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে অসাম্য বাড়িয়ে তুলেছে যা বাড়িয়ে তুলেছে সামাজিক টেনশান, দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সংকট এবং এই অসাম্যদীর্ণ সমাজই হিংসার পটভূমি তৈরি করছে। এর উপর ভিত্তি করেই সন্ত্রাসবাদীরা বিচ্ছিন্ন মানুষকে কাজে লাগাচ্ছে জঙ্গী কার্যকলাপে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন নিচুতলার মানুষ নানাভাবে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের দোসর হয়ে উঠছে। সমাজ থেকে হিংসা কমাতে হলে এবং রাষ্ট্রগুলিকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে বিশ্বব্যাপী লগ্নিপুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ ও দুষ্টচক্রের রাজনীতির অবসান চাই। শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ করেই বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অসাম্যও সন্ত্রাসবাদ ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অর্থনৈতিক সাম্য একমাত্র সমাজে শান্তি আনতে পারে।

বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে কতখানি বৃদ্ধি করেছে তা ভারতের দিকে তাকালে ধারণাটি পরিষ্কার হবে। বিশ্বায়নের তিন দশকে ভারতে এক দিকে যেমন আর্থিক বৃদ্ধির হার বেড়েছে, অন্য দিকে বেড়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। টমাস পিকেটি ও লুকাস চান্সেল এক গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, ১৯২২ সালে ভারতের ধনীতম ১ শতাংশের আয় ছিল মোট আয়ের ১৩.১ শতাংশ, ১৯৩৯-এ যা বেড়ে হয় ২০.৭ শতাংশ। স্বাধীনতার পরে পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সময় ধনীতম ১ শতাংশের আয় দেশের মোট আয়ের অনুপাতে লাগাতার কমতে থাকে, যা ১৯৮২ সালে হয় মাত্র ৬.১ শতাংশ। দেশে যখন বিশ্বায়নের নীতি চালু হয় এবং আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়ে, তখন অভূতপূর্ব গতিতে আর্থিক বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ২০১৫-তে তা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যায়, যেখানে ধনীতম ১ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের মোট আয়ের ২১.৩ শতাংশ। ১৯৮২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট আয়ের দরিদ্রতম ৫০ শতাংশের অনুপাত ২৩.৬ শতাংশ থেকে কমে হয় ১৪.৭ শতাংশ। অর্থাৎ, আর্থিক বৃদ্ধি যখন বেড়েছে, তার সুফল পেয়েছে দেশের ধনীতম অংশ, গরিবরা নয়।

(৭) বিশ্বায়ন, দারিদ্র্য ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

বিশ্বায়নের নামে যে নয়া উদারবাদী কর্মসূচি নেওয়ার কথা বলা হয়, সেটা আসলে মুষ্টিমেয়র স্বার্থে এবং মুনাফার স্বার্থে। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এক নয়া কৌশল এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যেখানে পুঁজিই সবকিছুর নির্ধারক। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার নির্দেশিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তা উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষেত্রে নতুন বিপদ ডেকে এনেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই কুড়ি বছরে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের ২৮টি দেশে ৫৪ শতাংশ দারিদ্র্য বেড়েছে। মানুষের গড় আয়ু কমে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন হার বাড়েনি। কারণ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলি বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এর কাঠামোগত কর্মসূচির নির্দেশাবলী মানতে গিয়ে তারা তাদের দেশে কৃষিতে, খাদ্যে, সারে, জ্বালানিতে ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করে এবং আমদানিতে শুল্ক চাপানো বন্ধ করে, পাশাপাশি ছাড় দেওয়া হয় বৃহৎ শিল্পপতিদের কর্পোরেশনগুলির আয়ের উপর এবং সরকারি ক্ষেত্রে বাজেট কমানোর পাশাপাশি সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ অনেকখানি সংকুচিত করা হয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ জনসাধারণের জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে আসে অন্ধকার।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের সাধারণ মানুষ তথা দরিদ্র মানুষের জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছে তা ভারতের একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বোঝা যাবে। ২০১১-১২ সালে এক জন ব্যক্তি গড়ে মাসে ১৫০১ টাকা ভোগ্যপণ্য ব্যয় করতেন, যা ২০১৭-১৮'তে কমে হয়েছে ১৪৪৬ টাকা (২০১১-১২ অর্থমূল্যে)। গত ৪৫ বছরে প্রথম বার ভারতে ভোগ্যপণ্যের উপরে মানুষের খরচ কমেছে। বিশেষত গ্রামীণ ভারতে এই হ্রাসের পরিমাণ ৮.৮ শতাংশ। শুধু তাই নয়, ২০১১-১২ এবং ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে গ্রামীণ ভারতে মানুষের খাদ্যপণ্যে খরচ কমেছে ৯.৮ শতাংশ। একই সঙ্গে লেবার ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে গ্রামীণ ভারতে কৃষি ও অকৃষি কাজে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি লাগাতার কমছে।

(৮) বিশ্বায়ন, গণমাধ্যম, গণতন্ত্র ও উন্নয়নশীল বিশ্ব :

গণমাধ্যম হল গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। বলাবাহুল্য নিরপেক্ষ ও স্বাধীন গণমাধ্যম যেকোনো দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সবল করে। কিন্তু গণমাধ্যম যদি তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত হতাশাজনক হবে। উদারিকরণের হাত ধরে গণমাধ্যমের বাজারে সূচিত হয়েছে সংঘটিত বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ। এর ফলে গণমাধ্যমেও কর্পোরেট সংস্থাগুলির লগ্নি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গণমাধ্যমগুলো কার্যত বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির দখলে। স্বাভাবিকভাবেই তারা গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গণমাধ্যমের বাণিজ্যকরণ মানে কার্যত গণতন্ত্রের বাণিজ্যকরণ। কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও রাজনৈতকি দলগুলি লাগাতার চেষ্টা করছে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পক্ষে প্রচার চালাতে। বিশ্বায়নের পণ্যায়িত সংস্কৃতিতে এখন সংবাদ পণ্য। অর্থাৎ কর্পোরেট এবং রাজনীতিবিদরা তাদের প্রভাব বাড়াতে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। যা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

7.5 মূল্যায়ন

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বকে একটি ভুবন গ্রামে পরিণত করেছে এবং বিশ্বায়নের বহুমাত্রিক প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে বিশ্বের কোন দেশ আর একক ভাবে থাকতে পারবে না। কারণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এতোখানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে কোন দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্নতার নীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। সে কারণে বিশ্বায়নকে গ্রহণ করা

বা না করা আর কোন দেশের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার নয়। সে চাইলেও তাকে বিশ্বায়ন গ্রহণ করতে হবে না চাইলেও বিশ্বায়নকে গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে-''সার্বভৌমত্বের হানি হবে এই আশঙ্কায় কোন রাষ্ট্র কি আজকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে দূরে দূরে থাকতে পারবে? দেখা যাচ্ছে দূরে সরে থাকার মূল্য প্রচণ্ড বেশি, যার ক্ষতি সামলানোর কম রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব" অর্থাৎ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতি-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়েছে বা হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের কোন দেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারবে না। এখানেই বিশ্বায়নের মাহাত্ম্য।

এখন প্রশ্ন হলো তাহলে উপায়? বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে সে ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে দোষারোপ করে লাভ নেই। সমস্যা হল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে পরিচালনার উপর অর্থাৎ বিশ্বায়ন অনেকক্ষেত্রেই উন্নত বিশ্বের দেশগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং সে কারণেই বিশ্বায়নের সুফল সকল দেশ সমানভাবে ভোগ করতে পারছে না। আবার অনেকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নতির জন্য সেই দেশগুলোর দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো এবং দুর্বল নেতৃত্বকেই দায়ী করেছেন। অর্থাৎ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর উন্নতির জন্য শুধুমাত্র একপেশে ভাবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোকে দায়ী করা ঠিক নয় বলে অনেকেই মনে করছেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, ''বিশ্বায়ন কি সত্যিই এক নতুন পাশ্চাত্য অভিশাপ? তাঁর মতে, সাধারণভাবে এটা নতুন নয়, অবধারিতভাবে পাশ্চাত্য নয়, এমনকি অভিশাপ নয়। বস্তুত ভ্রমণ, বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিস্তার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশৈলীসমেত বিদ্যা ও বোধের প্রসার ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বায়ন জগতের উন্নতি সাধন করে আসছে। এই বিশ্বায়িত আন্তঃসম্পর্ক বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের অগ্রগতিতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। আবার বিশ্বায়নের সক্রিয় কারকরা অএনক সময়েই পশ্চিম থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিলেন"।

7.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

(1) বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝ?

(2) উন্নয়নশীল বিশ্বের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(3) উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশ্বায়নের বহুমাত্রিক প্রভাব সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা কর।

7.9 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

(a) Bigman, D. (Ed.). (2002). *Globalization and the Developing Countries*. CABI Publishing.

(b) Stiglitz, J. (2002).*Globalization and Its Discontents*. Penguin Books.

(c) Steger, M. (2020).*Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

(d) বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পাদিত), বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, এন. বি. এ., কলকাতা, ২০০৮।

(e) সেন, অমর্ত্য, পরিচিতি ও হিংসা, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৬।

(f) ঘোষ, রতনতনু (সম্পাদিত), বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।

(g) মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয়, বিশ্বায়ন সংকট : উত্তরণ যেভাবে চলছে দুনিয়া, মনফকিরা, ২০১৬।

(h) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে এপ্রিল, ২০২০।

C.C : 3.1

Unit-8

New Social Movements and Politics of Alternative Development

Content :

8.1 Objective

8.2 Introduction

8.3 Basic Characteristics of "New Social Movements"

8.4 Theories of New Social Movements

8.5 New Social Movement: Political or Cultural?

8.6 Politics of Alternative Development

8.7 Conclusion

8.8 Questions

8.9 Suggested Readings

8.1 Objective

- To learn about the concept of new social movements.
- To learn about the differences between the earlier types of social movements and new social movements.
- To know about different theories of new social movements.
- To know major debates regarding new social movements.
- To know about politics of alternative development.

8.2 Introduction

Social movements are collective, organized, andsustained efforts to promote social change thatoccur partially or entirely outside conventionalpolitics. Their participants are often drawn frommarginalized segments of society that are excludedfrom decision-making processes. Thus, they mustengage in extra-institutional methods of politicalaction to exert political influence. These methodsmay be violent, non-violent, or a combination ofthe two.

New social movement theory is rooted in continental European traditions of social theory and political philosophy. This approach emerged in large part as a response to the inadequacies of classical Marxism for analyzing collective action. For new social movement theorists, two types of reductionism prevented classical Marxism from adequately grasping contemporary forms of collective action. First, Marxism's economic reductionism presumed that all politically significant social action will derive from the fundamental economic logic of capitalist production and that all other social logics are secondary at best in shaping such action. Second, Marxism's class reductionism presumed that the most significant social actors will be defined by class relationships rooted in the process of production and that all other social identities are secondary at best in constituting collective actors. These premises led Marxists to privilege proletarian revolution rooted in the sphere of production and to marginalize any other form of social protest. New social movement theorists, by contrast, have looked to other logics of action based in politics, ideology, and culture as the root of much collective action, and they have looked to other sources of identity such as ethnicity, gender and sexuality as the definers of collective identity. The term "new social movements" thus refers to a diverse array of collective actions that have presumably displaced the old social movement of proletarian revolution associated with classical Marxism. Even though new social movement theory is a critical reaction to classical Marxism, some new social movement theorists seek to update and revise conventional Marxist assumptions while others seek to displace and transcend them.

8.3 Basic Characteristics of "New Social Movements"

Despite the now common usage of the term "new social movement theory," it is a misnomer if it implies widespread agreement among a range of theorists on a number of core premises. It would be more accurate to speak of "new social movement theories," with the implication that there are many variations on a very general approach to something called new social movements. As a first approximation to this general approach, however, the following themes may be identified. First, most strands of new social movement theory underscore symbolic action in civil society or the cultural sphere as a major arena for collective action alongside instrumental action in the state or political sphere.

Second, new social movement theorists stress the importance of processes that promote autonomy and self-determination instead of strategies for maximizing influence and power.

Third, some new social movement theorists emphasize the role of postmaterialist values in much contemporary collective action, as opposed to conflicts over material resources.

Fourth, new social movement theorists tend to problematize the often fragile process of constructing collective identities and identifying group interests, instead of assuming that conflict groups and their interests are structurally determined.

Fifth, new social movement theory also stresses the socially constructed nature of grievances and ideology, rather than assuming that they can be deduced from a group's structural location.

Finally, new social movement theory recognizes a variety of submerged, latent, and temporary networks that often undergird collective action, rather than assuming that centralized organizational forms are prerequisites for successful mobilization. Many of these themes signify a divergence from both classical Marxism and resource mobilization theory as well as some points of convergence with social constructionism. But once again, various new social movement theorists give different emphases to these themes and have diverse relations with Alternative traditions, thereby warranting a language that speaks of new social movement theories (in the plural).

Beyond these themes is another defining characteristic of new social movement theories That warrants special emphasis. In differing ways, all versions of new social movement theory Operate with some model of a societal totality that provides the context for the emergence of Collective action. Different theorists operate with different models (referring variously to postindustrial society, an information society, advanced capitalism, etc.), but the attempt to theorize a historically specific social formation as the structural backdrop for contemporary forms of collective action is perhaps the most distinctive feature of new social movement theories. Having offered a first approximation to this paradigm, it will be helpful to consider several scholars who exemplify the range of thinking among new social movement theorists.

8.4 Theories of New Social Movements

This overview of major new social movement theorists will serveseveral purposes. First, it will illustrate the range of orientations that may be found in this area, as well as the distortion that is introduced when these very different perspectives are referred to as a single paradigm. Second, it will provide a foundation for a more detailed examination of the major debates associated with new social movement theories in the next section. Third, it will suggest the need for some organizing typology that summarizes but does not oversimplify the diversity of social movement theories. Four theorists best exemplify the range of new social movement theories in the context of their own intellectual traditions: Manuel Castells (Spain), AlainTouraine (France), Alberto Melucci (Italy), and JurgenHabermas (Germany).

Castells's focus is the impact of capitalist dynamics on the transformation of urban space and the role of urban social movements in this process. He argues that urban issues have become central because of the growing importance of collective consumption and the necessity of the state to intervene to promote the production of nonprofitable but vitally needed public goods. It is in this context that Castells sees the rise of urban social movements in a dialectical contest with the state and other political forces seeking to reorganize urban social life. He thus approaches the city as a social product that is a result of conflicting social interests and values. On the one hand, socially dominant interests seek to define urban space in keeping with the goals

of capitalist commodification and bureaucratic domination; on the other hand, grassroots mobilizations and urban social movements seek to defend popular interests, establish political autonomy, and maintain cultural identity. While arguing that class relationships are fundamental, Castells recognizes that they exist alongside other identities and sources of change, including the state as well as group identities based on gender, ethnicity, nationality, and citizenship. For Castells, urban protest movements typically develop around three major themes. First, some demands focus on the forms of collective consumption provided by the state, thereby challenging the capitalist logic of exchange value with an emphasis on the provision of use values in community contexts. Second, other demands focus on the importance of cultural identity and its links to territoriality, thereby resisting the standardization and homogenization associated with bureaucratic forms of organization by establishing and defending genuine forms of community. Finally, still other demands express the political mobilization of citizens seeking more decentralized forms of government that emphasize self-management and autonomous decision making. For Castells, the goals of collective consumption, community culture, and political self-management may be found in a wide variety of cross-cultural settings that warranthe concept of urban social movements.

Castells's analysis of urban social movements exemplifies several new social movement themes while also bringing a distinctive framing to these themes. The emphasis on cultural identity, the recognition of nonclass-based constituencies, the theme of autonomous self-management, and the image of resistance to a systemic logic of commodification and bureaucratization all serve to illustrate dominant strains in new social movement theories. At the same time, Castells remains closer to some of the concerns of conventional Marxism than many other new social movement theorists, and he does so by offering a "both/and" rather than an "either/or" stance toward some familiar social movement dichotomies. Thus, rather than counterpoising "old" class-based movements with "new" nonclass based movements, Castells recognizes the roles of both class-based and nonclass-based constituencies in urban social movements. Rather than contrasting "political" and "cultural" orientations, he recognizes that urban social movements contain a dialectical mixture of both orientations that finds expression in civil society and the state. Rather than dichotomizing between "instrumental" strategies and "expressive" identities, Castells acknowledges the mutual interplay between these themes in many urban social movements. Because of this more catholic and inclusive approach, Castells's version of new social movement theory is more attentive to the role of the state than some other versions of the theory that appear to eschew instrumental action altogether. As a result, he is more likely to recognize the role of political dynamics, such as changing political opportunity structures, than some other scholars of new social movementtheory. Finally, Castells's approach suggests the compatibility of a certain style of neo-Marxist analysis with at least some versions of new social movement theory.

Alain Touraine argues that with the passing of metasocial guarantees of social order, more and more of society comes to be seen as the product of reflective social action. The growing capacity of social actors to

construct both a system of knowledge and the technical tools that allow them to intervene in their own functioning-a capacity Touraine calls historicity-makes possible the increasing self-production of society, which becomes the defining hallmark of post-industrial or programmed society. The control of historicity is the object of an ongoing struggle between classes defined by relations of domination. Such classes take the form of social movements as they enter into this struggle. In post-industrial society, the major social classes consist of consumers/clients in the role of the popular class and managers/technocrats in the role of the dominant class. The principal field of conflict for these classes is culture, and the central contest involves who will control society's growing capacity for self-management. As the state becomes the repository of society's ever increasing capacity to control historicity, there is reason to believe that the central conflict in post-industrial society will come to center around this institution. In a recent formulation, Touraine (1992) locates new social movements between two logics: that of a system seeking to maximize production, money, power, and information, and that of subjects seeking to defend and expand their individuality.

Touraine's work anticipates several of the major debates associated with new social movement theory. One debate considers the likely constituency for such movements. In an empirical study of the workers' movement in France, Touraine and his associates reiterate his distinctive claim that there is one central conflict in every type of society. In industrial society, this conflict centred around material production and the workers' movement posed the obvious challenge. With the coming of post-industrial society, Touraine and his associates still expect one principal adversarial movement, although they remain uncertain about whether new social movements will fill this role. In a 1988 work, Touraine suggests both that there is no single class or group that represents a future social order and that different oppositional social movements are united simply by their oppositional attitude. Touraine's inability to define the constituency for collective action, despite his insistence that each societal type has a single central conflict, underscores the difficulties that newsocial movement theorists have in identifying the constituency for such movements. In Touraine's case, this uncertainty may be related to a second debate anticipated by his work concerning the seemingly apolitical nature of these movements. He sees contemporary social movements as evidence of a displacement of protest from the economic to the cultural realm, accompanied by the privatization of social problems. The typical result is an anxious search for identity and an individualism that may exclude collective action (1985). In another context, Touraine (1985) suggests that movements based on difference, specificity, or identity may too easily dismiss the analysis of social relations and the denunciation of power, and instill another work he (1988) suggests that appeals to identity are purely defensive unless they are linked with a counteroffensive that is directly political and that appeals to self-determination. As we shall see, this uncertainty over the political status of new social movements is a defining theme within this paradigm.

JurgenHabermas (1984-1987) proposes the most elaborate theory of modem social structure by distinguishing between a politico-economic system governed by generalized media of power and money and a lifeworld still governed by normative consensus. Whereas the system follows an instrumental logic that

detaches media like money and power from any responsibility or accountability, the lifeworld follows a communicative rationality requiring that norms be justifiable through discussion and debate. The problem for Habermas is that in modem society, system imperatives and logic intrude on the lifeworld in the form of colonization, resulting in the media of money and power coming to regulate not only economic and political transactions but also those concerning identity formation, normative regulation, and other forms of symbolic reproduction traditionally associated with the lifeworld. Habermas suggests that the relationship of clients to the welfare state is a model case for this colonization of the lifeworld, in that the welfare state monetarizes and bureaucratizes lifeworld relationships as it controls the extent and kind of spending on welfare policy to fit the imperatives of money and power. More generally, Habermas argues that the process of colonization alters each of the basic roles that arise from the intersection of the politico-economic system and public and private lifeworld: employee, consumer, client, and citizen. In each case, these dynamics locate more and more decision-making power in the hands of experts and administrative structures, which operate according to the system logic of money and power and whose decisions are correspondingly removed from contexts of justification and accountability within the lifeworld.

Given this conception of social structure, Habermas locates new social movements at the seams between system and lifeworld. This location leads him to identify two features of these movements that have shaped further debates within new social movement theory. First, Habermas seems to imply that new social movements will have a purely defensive character: at best, they can defend the lifeworld against the colonizing intrusion of the system and sustain the role of normative consensus rooted in communicative rationality that has been evolving within this sphere throughout the process of societal modernization. But Habermas offers little evidence that new social movements can contribute to any broader social transformation, particularly concerning the dominance of system over lifeworld and the dominance of generalized media of exchange like money and power in the system world. As we shall see, while no one sees new social movements as bringing about complete societal transformation, many of its theorists envision a more extensive and progressive role for movements than simply defending the lifeworld. A second Habermasian theme, which is more broadly accepted among new social movement theorists, concerns the nature of the goals or demands associated with these movements. For Habermas, as for many others, the conflicts in which new social movements engage are less about material reproduction and more about cultural reproduction, social integration, and socialization. The new movements bring with them a new politics concerned with quality of life, projects of self-realization, and goals of participation and identity formation. Many of these movements are united around the critique of growth as a central ideological foundation, with ecology and peace movements playing central roles. Because these are not traditional distributional struggles, Habermas implies that they cannot be channeled by political parties or allayed by material compensation. The implication is that under some circumstances, the conflicts associated with new social movements may contribute to the larger legitimation crisis that Habermas (1975; 1984-1987) associates with advanced capitalism.

Alberto Melucci argues that the (post-)modem world brings new forms of social control, conformity pressures, and information processing to which new social movements respond. The movements are triggered by new sites of conflict that are interwoven with everyday life; the conflict itself involves symbolic codes, identity claims, and personal or expressive claims. Melucci would thus concur with Touraine that the political status of new social movements is unclear, but he is less troubled by this fact than Touraine. While these conflicts are far removed from the conventional political sphere, they are not without structural effects that are central in Melucci's argument. In a society increasingly shaped by information and signs, social movements play an important role as messages that express oppositional tendencies and modalities. The very focus on personal, spiritual, or expressive aspects of modem life typical of new social movements is an implicit repudiation of the instrumental rationality of the dominant society. Perhaps the most important systemic effect of new social movements is to render visible the peculiarly modern form of power that resides behind the rationality of administrative procedures; in this way, collective action emphasizes the socially constructed nature of the world and the possibility of alternative arrangements. Melucci's positive view of these movements and their messages underscores the importance of free spaces between the level of political power and everyday life in which actors can consolidate collective identities through both representation and participation.

Melucci's work also helps to define some of the central issues of new social movement theory. One such issue concerns the role of identity in modern collective action. Melucci's starting premise is that in modern society, the pace of change, the plurality of memberships, and the abundance of messages all combine to weaken traditional points of reference and sources of identity, thereby creating a homelessness of personal identity. This means that people's propensity to become involved in collective action is tied to their capacity to define an identity in the first place (Melucci 1988). It also means that the social construction of collective identity is both a major prerequisite and a major accomplishment of the new social movements.' The fluidity of identity in the modern world and in its social movements is related to the fragility of organization in such movements. Melucci is insistent that new social movements be seen as ongoing social constructions rather than as unitary empirical objects, givens or essences, or historical personages acting on a stage. In contrast to these concep-tions, whatever unity movements may achieve is a result of ongoing efforts rather than an initial starting point for collective action. On another level, Melucci steers attention away from formal organization by stressing that much collective action is nested in networks of submerged groups that occasionally coalesce into self-referential forms of organization for struggle-but often on a temporary basis. He thereby suggests that we speak less in terms of movements and more in terms of movement networks or movement areas to capture the transitory nature of much contemporary mobilization.

These sketches hint at some of the main contours of new social movement theory while also suggesting its diversity. This diversity derives in part from the different national settings in which theorists like Castells,Touraine, Habermas, and Melucci have operated, as well as the rather different histories of social protest within each nation. This diversity also derives from the different theoretical traditions that inform the

work of these theorists: Castells extends Marxist analyses of collective consumption, Touraine builds on his pathbreaking work on postindustrial society, Habermas works out of the German tradition of critical theory, and Melucci introduces some semiotic and postmodern elements. As suggested earlier, this diversity warrants speaking of “new social movement theories” rather than a unitary “new social movement theory.” Yet there are important threads of continuity across these thinkers. Despite their differences, all concur that their societies have moved into a distinct social formation that might be designated as post-industrial, advanced capitalism and that the structural features of their societies have shaped the kinds of current collective action as decisively as the structural features of liberal capitalism shaped the dynamics of proletarian protest. While these sketches have hinted at some of the issues that define the paradigm of new social movement theory, a more systematic presentation of these debates is now in order.

8.5 New Social Movement: Political or Cultural?

There is a debate among the social movements scholars regarding the question: whether new social movements are “political” in nature or are better classified in some other way (e. g., as “cultural”). One danger in these discussions is that such terminology can create and perpetuate unfortunate dichotomies that obscure more than they reveal about movements. That is, all movements rest on cultural foundations and play some representational or symbolic function-hence all movements are cultural in some basic way (McAdam 1994). Similarly, all movements take explicit or implicit political stances, and it can be argued that even those which opt out of any conventional contestation for power have taken a political stance of quietism-hence all movements are political in an equally basic way. These considerationsshould be taken as reminders that such distinctions can be no more than sensitizing devices that highlight features of movements that are inevitably more complex than any such binary classificatory system. Nevertheless, the discussions about the political dimension of new social movements tap profound questions about their transformative potential. The operative definition of political in most of these discussions seems to involve two fundamental dimensions: political movements are at least in part focused on influencing or altering state power, and such movements must thereby have some explicit strategy aimed at transforming power relations.

One way of challenging the political nature of new social movements is to argue that they are about something larger than conventional politics; Brandt (1986) thereby casts new social movements as providing a metapolitical challenge to modernity through a new historical type of protest. He sees these movements as carriers of a classical critique of modern civilization as well as the very project of modernity. Even though he classifies them as metapolitical, he identifies them as having discrete, political effects in terms of consciousness-raising, political socialization, and the politicization of decision making. The more standard critique of new social movements is that they are an apolitical or at least a prepolitical form of social activism. These critiques typically use the protests of the 1960s as a positive benchmark, when moveMovements as providing a

metapolitical challenge to modernity through a new historical type of protest. He sees these movements as carriers of a classical critique of modern civilization as well as the very project of modernity. Even though he classifies them as metapolitical, he identifies them as having discrete, political effects in terms of consciousness-raising, political socialization, and the politicization of decision making. The more standard critique of new social movements is that they are an apolitical or at least a prepolitical form of social activism. These critiques typically use the protests of the 1960s as a positive benchmark, when movements combined political and cultural dimensions in a desirable balance that still attempted to transform power relations. In the 1970s and 1980s, however, some of these movements shifted to a predominantly cultural orientation in which questions of identity and "identity politics" became predominant. With this change, the notion of "the personal is political" became deformed in such a way that excessive attention to personal life came to substitute for any sustained form of political action aimed at institutionalized power, and lifestyle politics thereby replaced previous movement politics aimed at social transformation. As a result, such movements and their participants jettisoned any concern with influencing or altering state power, abandoned discussions of strategy, and withdrew into cultural cocoons of personal lifestyle issues as a replacement for a previously political orientation (Boggs 1986; Carroll 1992; Epstein 1991). In the sharpest version of this critique, L. A. Kauffman (1990) argues that such antipolitics of identity leads to apolitical introspection, an emphasis on politically correct lifestyles, and the substitution of personal transformation for political activity. Despite the radical veneer that may cover such stances, Kauffman argues that they actually mirror and promote the values of the marketplace.

The most interesting rejoinder to these arguments can be derived from the work of Alberto Melucci (1989), whose stance is not that the new social movements are political (in any conventional sense of the term) but rather that it is just as well that they are not. If the new movements were more political in the conventional sense of that term, they would be playing by sets of rules that benefit existing power-holders and they would in all likelihood be much easier to co-opt through the normal channels of political representation and negotiation. Hence, their apolitical or antipolitical stance should be regarded as a strength rather than a weakness. However, to be apolitical in this sense does not mean a retreat into excessively individualist orientations for Melucci. Although he operates with a culturalist reading of new social movements, he also believes that such culturalist movements can pose major challenges to existing social relations. In part, this is because these relations have come to be defined more and more in the cultural language of symbolic representation. Thus, if power has become congealed, particularly in media messages and administrative rationality, the most profound challenge to such power may come from cultural movements that challenge these messages and rationality. By rendering power visible and by repudiating the instrumental rationality of the dominant society, cultural movements may be more effective than conventionally political movements at, in Melucci's terms, breaking the limits of compatibility of the system.

Like other issues already discussed, this debate is about more than one issue, and sometimes it is not about the same thing. For example, the sharpest critics of the apolitical turn in some new social movements

are writing in the context of the United States, while Melucci and new social movement theory generally has emerged from a European context. Hence, a peculiarly American factor-such as individualism as a dominant cultural theme-may be the target of these critics. The critics also tend to be affiliated with a New Left strain of democratic socialism that provides them with an implicit model of which political stances movements ought to take and forms the benchmark for their critiques of the movements that fall short of this standard. But the positions in this debate ultimately reflect the theoretical stances of its participants as well as the way their stances conceptualize the dominant society and its recent changes. Those who criticize the apolitical nature of (some) new social movements tend to see modern society as predominantly capitalist. Although they may have transcended traditional Marxist positions on the role of"old social movements," they remain wedded to aconception of capitalism as a systemic form of domination that must ultimately be challenged in political terms. Those who defend the apolitical or cultural dimensions of new social movements appear to subscribe to a different theory of modem society that leans more heavily on postmodem, semiotic, or generally culturalist themes. Thus, each theoretical school can claim to have identified the more fundamental kind of (political or cultural) challenge that new social movements might offer to the dominant society, but these claims reflect their prior theoretical stances as much as any consistent set of observations about the movements themselves.

8.6 Politics of Alternative Development

Assuming a conventional understanding of 'development', there are many parts ofthe developing world where such a process is littlein evidence and some where it might even seemto be in retreat. There are also those who questionthe validity of such conventional understandingsof 'development', who indeed see development itself as an ideological construct subservient to theinterests of Western donors, the international aid'industry' and suchlike. We recognize the force ofmany of these arguments. At any rate, whatever term is favoured, there has also been a growing appreciation of the very considerable diversity to be found among and within those countries traditionally seen to come under its umbrella, and the widening of differences in their role and stance towards major issues in world politics.

In many parts of the developing world, grass-roots movements have emerged as a political force to be reckoned with. People excluded from politics are increasingly engaging in organized collective action to defend their livelihoods, promote a more equitable distribution of land and resources, challenge state and corporate-driven development policies, and advance democratization.From the 1980s onward, citizens in numerous authoritarian regimes mobilized campaigns of non-violent resistance to challenge the entrenched political elite and promote democratization (Schock2005). Marginalized peoples suffering from negative consequences of the 'development project' and the globalization project of neo-liberalism struggle against deforestation, over-fishing, industrial and export agriculture, large dam projects, and increasing land inequality. Furthermore, resistance is being mobilizedagainst neo-liberal economic policies and the 'newenclosures', such as theprivatization

of public utilities and resources, andan intellectual property rights regime that contributes to the privatization and commodificationof resources and traditional knowledge of peasantsand indigenous peoples.

Much resistance takes the form of people power movements that attempt to transform the politics, economics, and social relations ofdeveloping countries. Traditional strategies such as participating in institutional politics or seizing state power through violence are increasingly being discarded for a social movements approach that mobilizes peoplethrough loose networks, engages in non-violentdirect actions, and promotes democratization andsustainable development.

The development policies implemented by manydeveloping countries over the past half-centuryhave prioritized constructing large dams, promoting industrial farming and export-orientedagriculture, and extracting timber and minerals.These policies have contributed to the displacement ofpeople, the privatization of communal landand resources, increasing levels of land inequality, and environmental degradation. They havethreatened the material bases of small farmers,landless rural workers, and indigenous peoples.In response, social movements with strong critiques of the dominant models of developmenthave mobilized and pursued goals consistent withenvironmentalism, sustainable development, andgrass-roots democracy. Social movements, likethose discussed above, not only resist destructivepolicies. They also challenge entrenched systems of inequality and traditional rural social relationssuch as authoritarianism, violence, and patriarchy,with traditional caste relations in India and traditional patron-client in both Thailand and Brazilbeing good examples. All three organizations promote gender equality and empower people to take astand against corruption, violence, and traditionaldeference to authority.

These social movement organizations, and others like them, have adopted organizational formsand politics that represent a distinct break from thepast. They have broken from old ideological campsand deliberately eschewed the conventional political party and lobby group format for a networkedsocial movement approach. They reject the goals ofbecoming political parties or seizing state power.Instead they attempt to transcend institutionalpolitics by emphasizing grass-roots participatorydemocracy, decentralization, and organizationalautonomy from political parties and the state.They organize marginalized people to increasetheir power to influence the state through extrainstitutional methods of protest, non-cooperation,and disruption. Just as importantly they stress theempowerment of poor people and their collectivecapacity to address the problems they experience.

In addition non-violentstrategies provide a sharpcontrast to guerrilla insurgencies and traditionalanti-imperialist movements that used violenceto capture state power. They also contrast withthe violence that has characterized enclosures,colonization, the expropriation of land and resources by states and corporations, and violentrepression against people protesting elite imposeddevelopment policies.

In order to break vicious cycles of violence,these struggles have responded creatively. Theirmethods of non-violent action have been used tomobilize people, draw attention to significant socialproblems, and

generate pressure against their opponents. Direct actions have been taken to rectifyproblems that governments have failed to address.Rather than challenging the state on its own terms,the people use methods with which they have acomparative advantage, through mass-based non-violent resistance.

Significantly, there is an increasing tendency toward using non-violent resistance in struggles overland, resources, and development policies, evenamong struggles that were originally violent, suchas the Zapatista rebellion in the Chiapas state of Mexico. The Zapatista Army of National Liberation (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional,EZLN) emerged in 1994 in opposition to the NorthAmerican Free Trade Agreement (NAFTA) thatopened the Mexican economy to North Americanenterprises. Its struggle is framed as an indigenousstruggle against imperialism. It promotes the autonomy of the indigenous people in Chiapas, theirright to use and benefit from the resources in theirregion, and their right to exercise communal control of land, something that was outlawed by theNAFTA agreement. After 1994 the Zapatistas increasingly turned to non-violent action to promotetheir cause, although, isparadoxically, they continueto be armed.

Non-violent resistance may be the most promising strategy for addressing problems associatedwith enclosures, commodification, and privatization, and for transforming the dominant development model. In contrast, throughout Africa andAsia violent movements for national liberation,for example, have typically resulted in authoritarian regimes that then used state power to exploitresources and labour.

Non-violent strategies have a number ofstrengths: (1) their means are consistent with theirends; (2) they allow maximum popular participation; (3) they are more likely to win over opponentsand third parties; (4) they lead to more lastingchange, because they mobilize a larger portion of the population in a participatory fashion than violenceor official channels; and (5) their struggles usuallyresult in fewer casualties (Martin 2001; 2006).

Nevertheless, a problem with pro-democracymovements in particular is that while they unitea diverse opposition to challenge the authoritarian regime, once a transition occurs, there tendsto be conflict and fragmentation among the previously united opposition. In the Philippines, forexample, after the successful people power movement, members of the traditional elite regainedpolitical prominence while the more progressivesegments of the movement were marginalized(Mendoza 2009). Moreover, the process of democratization may be deflected into moves to establishlimited democracy and a neo-liberal economy,under the influence of the US government andinternational financial institutions seeking to prevent genuinely popular democracy from taking root(Robinson 1996). Other problems with promotingsocial change through social movements includethe inadequate resources available to poor people,the difficulty of aggregating diverse groups into acoordinated movement, maintaining social mobilization and the capacity to disrupt over extendedperiods, the co-option of movement leaders byruling elites, the formal institutionalization of themovement and consequent loss of vitality, and, ofcourse, the vulnerability to state or paramilitaryrepression.

8.7 Conclusion

From the 1980s onward, a wave of people powermovements challenged authoritarian regimesthroughout the developing world. Many movements contributed to human rights and democratization. Less dramatically, but perhaps more importantly, people power movements have also emergedthroughout the developing world to challengethe dominant development logic and neo-liberaleconomic policies. Drawing on human rights,environmentalism, and sustainable developmentdiscourses, these movements are increasingly becoming linked through transnational networks.

8.8 Self Assessment Questions

(1) Briefly discuss about the concept of new social movement. How does it differ from its older counter part.

(2) What are the features of the new social movements?Analytically discuss the cultural and political logic of new social movements.

(3) Critically discuss different theoretical approaches of new social movements.

(4) Critically evaluate the political logic of alternative development in the context of developing world.

8.9 Suggested Readings

(a) Burnell, Peter, Randall, Vicky, &Rakner, Lise. (2011). Politics in the Developing World. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.

(b) Chesters, Graeme, & Welsh, Ian. (2011). Social Movements: The Key Concepts. Oxon: Routledge.

(c) Mukherjee, Subrata, &Ramaswamy, Sushila. (2017). Theoretical Foundations of Comparative Politics. Hyderabad: Orient Blackswan.